বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম.এ. তৃতীয় সেমেস্টার

ডি এস ই / DSE : ৩০১

বিশেষ পত্র ঃ নাটক ও নাট্যমঞ্চ

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

(ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া - ৭৪১ ২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

Post Graduate Board of Studies (PGBOS) Members of Department of Bengali, Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Sl. No.	Name & Designation	Role
1	**Prof. (Dr.) Sanjit Mondal,** Professor & Head, Department of Bengali, University of Kalyani.	Chairperson
2	**Prof. (Dr.) Sabitri Nanda Chakraborty** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
3	**Prof. (Dr.) Sukhen Biswas,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
4	**Prof. (Dr.) Prabir Pramanick,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
5	**Prof. (Dr.) Nandini Bandyopadhyay,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
6	**Prof. (Dr.) Adityakumar Lala,** Professor, Department of Bengali, Gourbanga University	External Nominated Member
7	**Prof. (Dr.) Narugopal Dey,** Professor, Department of Bengali, Sidho Kanho Birsha University	External Nominated Member
8	**Dr. Rajsekhar Nandi,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
9	**Dr. Shrabanti Pan,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
10	**Prof. (Dr.) Sanjib Kumar Datta,** Director, DODL, University of Kalyani	Convener

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক ড. তাপস বসু — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামাণিক — বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. সঞ্জিৎ মণ্ডল — বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. সত্যকুমার গিরি — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

আগস্ট ২০২৩

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ২০৯এ, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of Distance and reaching the unreached students are the three fold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellorhas invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavor. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor **(Dr.) Amalendu Bhunia, Hon'ble Vice-Chancellor, University of Kalyani**, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it with in proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks are also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I wouldespecially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and coordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyrights reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Professor (Dr.) Sanjib Kumar Datta
Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

পাঠক্রম

বাংলা

প্রতি পত্রের পূর্ণমান–৫০

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম.এ. তৃতীয় সেমেস্টার

ডি এস ই / DSE : ৩০১

বিশেষ পত্র : নাটক ও নাট্যমঞ্চ

উনিশ শতকের নাটক

পর্যায় গ্রন্থ : ১ কুলীনকুলসর্বস্ব – রামনারায়ণ তর্করত্ন (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক–১ : কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের কাহিনি-বহুমাত্রিক সমাজ-সমস্যার চিত্রশালা

একক–২ : নারী চরিত্র

একক–৩ : কুলীনকুলসর্বস্বে সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভাব

একক–৪ : সংলাপ

পর্যায় গ্রন্থ : ২ কৃষ্ণকুমারী – মধুসূদন দত্ত (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক–৫ : ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে 'কৃষ্ণকুমারী'র সার্থকতা

একক–৬ : ট্রাজেডি বিচার

একক–৭ : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব

একক–৮ : নারী ও পুরুষ চরিত্র

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ একেই কি বলে সভ্যতা? – মাইকেল মধুসূদন দত্ত (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক–৯ : 'একেই কি বলে সভ্যতা?' নাটকের সাধারণ পরিচয়

একক–১০ : প্রহসন রূপে 'একেই কি বলে সভ্যতা?'

একক–১১ : সংলাপ

একক–১২ : চরিত্র

পর্যায় গ্রন্থ : ৪ আলিবাবা – ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক–১৩ : 'আলিবাবা' নাটকের অভিনয়

একক–১৪ : 'আলিবাবা' নাটক রচনার প্রেরণা, মৌলিকতা এবং নৈতিক শিক্ষা

একক–১৫ : মর্জিনা চরিত্র

একক–১৬ : সংলাপ ও সংগীত

সূচিপত্র

তৃতীয় সেমেস্টার

ডি এস ই / DSE : ৩০১

উনিশ শতকের নাটক

ডি এস ই : ৩০১	একক	পাঠ প্রণেতা	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ-১	১	ড. সত্যকুমার গিরি	কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের কাহিনি-বহুমাত্রিক সমাজ-সমস্যার চিত্রশালা	১
	২	ড. সত্যকুমার গিরি	নারী চরিত্র	১৭
	৩	ড. সত্যকুমার গিরি	কুলীনকুলসর্বস্বে সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভাব	২৪
	৪	ড. সত্যকুমার গিরি	সংলাপ	৩০
পর্যায় গ্রন্থ-২	৫	অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামাণিক	ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে 'কৃষ্ণকুমারী'র সার্থকতা	৩৫
	৬	অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামাণিক	ট্রাজেডি বিচার	৫০
	৭	অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামাণিক	প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব	৫৫
	৮	অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামাণিক	নারী ও পুরুষ চরিত্র	৬১
পর্যায় গ্রন্থ-৩	৯	অধ্যাপক ড. সঞ্জিৎ মণ্ডল	'একেই কি বলে সভ্যতা?' নাটকের সাধারণ পরিচয়	৭০
	১০	অধ্যাপক ড. সঞ্জিৎ মণ্ডল	প্রহসন রূপে 'একেই কি বলে সভ্যতা?'	৭৬
	১১	অধ্যাপক ড. সঞ্জিৎ মণ্ডল	সংলাপ	৮৩
	১২	অধ্যাপক ড. সঞ্জিৎ মণ্ডল	চরিত্র	৮৬
পর্যায় গ্রন্থ-৪	১৩	অধ্যাপক ড. তাপস বসু	'আলিবাবা' নাটকের অভিনয়	৮৯
	১৪	অধ্যাপক ড. তাপস বসু	'আলিবাবা' নাটক রচনার প্রেরণা, মৌলিকতা এবং নৈতিক শিক্ষা	৯৪
	১৫	অধ্যাপক ড. তাপস বসু	মর্জিনা চরিত্র	৯৭
	১৬	অধ্যাপক ড. তাপস বসু	সংলাপ ও সংগীত	১০০

পর্যায়গ্রন্থ - ১

একক - ১

কুলীনকুলসর্বস্ব কাহিনি-বহুমাত্রিক সমাজ-সমস্যার চিত্রশালা

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.১.১.১ : বাঙালীর কৌলীন্য প্রথা

৩০১.১.১.২ : ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজে কৌলীন্য প্রথার বিকট রূপ

৩০১.১.১.৩ : কৌলীন্যপ্রথা ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক প্রতিক্রিয়া

৩০১.১.১.৪ : কৌলীন্যপ্রথা-বিরোধী প্রথম প্রহসন 'কুলীনকুলসর্বস্ব'

৩০১.১.১.৫ : উদ্দেশ্যমূলক নাটক হিসেবে কুলীনকুলসর্বস্ব

৩০১.১.১.৬ : কুলীনকুলসর্বস্বের কাহিনী — বহুমাত্রিক সমাজ-সমস্যার চিত্রশালা

৩০১.১.১.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০১.১.১.১ : বাঙালীর কৌলীন্য প্রথা

'কুলীন' শব্দের অর্থ সৎকুলে জাত, কুলমর্যাদাযুক্ত, অভিজাত ব্যক্তি। আর কৌলীন্য হল - (সং-) কুলীন +য। কিন্তু 'কৌলীন্য' শব্দটির ব্যুৎপত্তিবহির্ভুত আর এক অর্থপ্রকাশের শক্তি আছে। এই রূঢ়ার্থটি হল, ব্রাহ্মণদের বিশেষভাবে চিহ্নিত কয়েকটি বংশে জাত ব্যক্তিদেরই কুলীন বলা হয়। সামাজিক ভাবে এই কুলীনদের স্বতন্ত্র একটা মর্যাদা গড়ে উঠেছিল। বিবাহাদি বিষয়ের পৃথক রীতিনীতিতে কুলীনরা সুচিহ্নিত ছিল। এই রীতিনীতিই কৌলীন্যপ্রথা।

১৪৮৫-৮৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত ধ্রুবানন্দ মিশ্রের 'মহাবংশাবলী' একটি কুলজীগ্রন্থ। এছাড়াও আছে হরিহর মিশ্রের 'কারিকা', সর্বানন্দ মিশ্রের 'কুলতত্ত্বার্ণব', ধনঞ্জয়ের 'কুলপ্রদীপ' রামানন্দ শর্মার 'কুলদীপিকা' প্রভৃতি এই ধারার কুলজীগ্রন্থ। এই সব গ্রন্থসর্বত্র সঙ্গতিপূর্ণও নয়, কোথাও পরস্পর বিরোধীও। এগুলির ঐতিহাসিকতা নিয়ে নানা সঙ্গত প্রশ্নও উত্থাপন করেছেন পণ্ডিতবর্গ। তবুও কুলজী গ্রন্থগুলির একটা বিষয়ে সহমত লক্ষ করা যায়। আদিশূর নামক গৌড়ের জনৈক রাজা একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কনৌজ থেকে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করে আনেন যজন কার্য সম্পাদনের জন্য। অন্যদিকে ঐতিহাসিকদের আরও প্রশ্ন, বঙ্গদেশে আদিশূর নামের সত্যিই কোনো রাজা ছিলেন কিনা? ঐতিহাসিকগণ এই রাজার রাজত্বকাল সম্পর্কে কোনো ভাবেই যেমন নিশ্চিত নন, তেমনি কুলজীকারগণেরও এ বিষয়ে নানা মতপার্থক্য। লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁর 'সম্বন্ধনির্ণয়ে' এবং নগেন্দ্রনাথ বসু 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে' আদিশূরের কুলজী প্রদত্ত যে

সময়গুলি উল্লেখ করেছেন, তাতে ঐক্যের কোনো আভাস মাত্র নেই। এই সময়গুলি হল — ৬৫৪, ৬৭৫, ৮০৪, ৮৬৪, ৯১৪, ৯৫৪, ৯৯৪ এবং ৯৯৯ শকাব্দ। তবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে জনপ্রিয় মতটির উল্লেখ করেছেন। 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা, এতদ্বিষয়ক বিচার' গ্রন্থে। মতটি হল — ৯৯৯ শকাব্দে আদিশূরের আমন্ত্রণে আলোচ্য পঞ্চব্রাহ্মণ বাংলাদেশে আসে। রাজ-পৃষ্ঠপোষিত এই পঞ্চব্রাহ্মণের বংশ কালে কালে দ্রুত বিস্তারলাভ করে। কিন্তু এই সব বংশের অধস্তনগণ পারিবারিক শাস্ত্রীয় যাজনিক বিদ্যা ও আচারের ঐতিহ্য বিস্মৃত হন। লালমোহন বিদ্যানিধির মতে আদিশূরের বংশধর বলে কথিত সেনবংশীয় রাজা বল্লাল সেন (আনুমানিক—১১৫৮-১১৯১) দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গুণের তারতম্য অনুসারে এই ব্রাহ্মণদের বংশধরগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। কনৌজাগত পাঁচ ব্রাহ্মণের উত্তরপুরুষদের মধ্যে আটগাঁইয়ের ঊনিশ জনের মধ্যে আচার-বিনয়-বিদ্যাদি নয়টি গুণ লক্ষ করে তাঁদের কুলীন মর্যাদা দান করেন। চৌত্রিশ গাঁইয়ের বংশধরগণ শ্রোত্রিয় হিসেবে পরিচিত হন। বাকি চৌদ্দ গাঁইয়ের বংশধরগণ সদাচারী ছিলেন না বলে গৌণ কুলীন হিসেবে আখ্যায়িত হন।

নয়টি গুণের নিরিখে কৌলীন্য নিরূপনের প্রসঙ্গ থেকে মনে হয়, বল্লাল সেন কৌলীন্যকে বংশগত বিষয় হিসেবে নয়—ব্যক্তিগত গুণের বিষয় হিসেবেই গণ্য করেছিলেন। না হলে আট গাঁইয়ের মাত্র উনিশ জন সদস্য সে মর্যাদা পেতেন না, অন্যান্য সব সদস্যই সমান মর্যাদা পেতেন। কিন্তু কালক্রমে কৌলীন্য ব্যক্তিগত গুণের বিষয় না হয়ে, পারিবারিক মর্যাদার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। নয়টি গুণ নয়, একটি গুণই—'আবৃত্তি' অর্থাৎ সমান উৎকৃষ্ট গৃহ থেকে কন্যা গ্রহণ বা এসব গৃহে কন্যাদান কৌলীন্যের একমাত্র মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। প্রথা হয়ে দাঁড়ায়, কুলীনরা কেবল কুলীন পরিবারের সঙ্গেই বৈবাহিক আদান-প্রদান করবেন। পরিস্থিতি বিশেষে শ্রোত্রিয়-কন্যা গ্রহণ অনুমোদিত হয়, কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান নিষিদ্ধ হয়। গৌণকুলীনের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কও কুলনাশক বলে গণ্য হয়। এ-রীতি ভঙ্গ হলে কুলীনরা বংশজে পরিণত হন। বংশজের কন্যা গ্রহণ করলেও কুলীনরা বংশজে পরিগণিত হন। এভাবেই কুলীন শব্দ পরিবারের বিবাহ-রীতির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়। আসলে বিবাহ বিষয়ক একটিমাত্র রীতি পালন করেই কুলীনরা নিজেদের মর্যাদা রক্ষার পথ গ্রহণ করে।

বল্লাল সেন কৌলীন্য মর্যাদা প্রবর্তন করার কিছুকালের মধ্যেই কুলীনদের মধ্যে নবগুণের ধারণা ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যায়। ফলে কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তনের সময় থেকে দশপুরুষের মধ্যে ১৪৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দে সেকালের বিখ্যাত ঘটক দেবীবর পুনরায় কৌলীন্য প্রথার সংস্কার করেন। বল্লাল সেন গুণের বিচারে কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তন করেছিলেন, দেবীবর দোষের তারতম্য অনুসারে কুলীনদের ৩৬টি মেলে বিভক্ত করেন। আর নির্দিষ্ট মেলের মধ্যেই বৈবাহিক সম্বন্ধকে সীমাবদ্ধ রাখার বিধান দেন। এই সংস্কারের দ্বারা দেবীবর অধিকতর সামাজিক অবক্ষয় রোধ করতে চেয়েছিলেন।

একথা ঠিক যে, দেবীবরের সংস্কার কুলীনদের সামাজিক প্রতিপত্তি রক্ষায় সাহায্য করেছিল। কিন্তু এর ফলে আর একধরনের সামাজিক ব্যাধির জন্ম হয়। সমাজে বহুবিবাহ প্রথা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় দেখা যেত, বিশেষ গাঁই ও গোত্রের অনেক কন্যার জন্য বিধিমিতো একজনই বর পাওয়া যাচ্ছে। এ অবস্থায় কৌলীন্য রক্ষার জন্য এক কুলীন পাত্র একাধিক কুলীন কন্যার পাণিগ্রহণ করতো। কৌলীন্য প্রথার সঙ্গে বহুবিবাহের সামাজিক ব্যাধি এভাবেই যুক্ত হয়ে পড়ে।

বল্লাল সেন, লক্ষণ সেন এবং শেষে দেবীবরের কৌলীন্যপ্রথা সংস্কারের মধ্যদিয়ে সমাজে যে বহুবিবাহ প্রথার উদ্ভব ঘটে তা হিন্দু শাস্ত্রে নিষিদ্ধই ছিল। 'বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার, দ্বিতীয় পুস্তক'-এ বিদ্যাসাগর সে কথা আমাদের স্পষ্ট করেই জানিয়েছেন। কিন্তু এই বহু বিবাহের সামাজিক প্রবণতা ব্রাহ্মণ সমাজে দুষ্টক্ষতের মতো বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়ায়।

এই সঙ্গে আর এক সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যে ১৯ জনকে রাজসম্মান হিসেবে কুলীন মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল, তাদের সামাজিক প্রতিপত্তি অনেক বৃদ্ধি পায়। এতে অকুলীন ব্রাহ্মণরা কুলীনদের শ্রদ্ধা অথচ ঈর্ষার চোখে দেখতে শুরু করে। অথচ তাদের কুলীন মর্যাদা লাভের পথও খোলা ছিল না। কুলীনরা সমান অথবা তদুচ্চ বংশে কন্যা গ্রহণ করবেন — এটাই ছিল বিধি। কিন্তু অকুলীন শ্রোত্রিয়, বংশজ এবং গৌণ কুলীনগণ অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে কুলীন পাত্রে কন্যাদানের চেষ্টা করতেন — কিছু ক্ষেত্রে সফলও হতেন। এই ভাবে অকুলীনের কুলমর্যাদা বৃদ্ধির পথ কিছুটা উন্মুক্ত হয়।

এই প্রচেষ্টায় অকুলীনদের পক্ষে অবস্থাটা বিশেষ অনুকুলও ছিল। রাজসম্মানে সম্মানিত কুলীনগণ সমাজে একটা অতিরিক্ত সুবিধা আদায় করার অবস্থানে অবস্থিত ছিল। এই বর্ধিত সুযোগ-সুবিধা তাদের কালে কালে অলস ও বিদ্যাহীন করে তুলেছিল। ফলে তারা সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বেঁচে থাকার উপায় হিসেবে কেবল কৌলীন্যের মূলধনটুকুই ছিল। সামাজিক উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য কুলীনরা দ্রুত অর্থনৈতিকভাবে শক্তিহীন হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় অকুলীনরা মোটা অর্থ নিয়ে এগিয়ে আসে কুলীন পাত্রে কন্যাদান করে নিজেদের কুলমর্যাদা বাড়িয়ে নিতে।

গোড়াতে নিয়ম ছিল শ্রোত্রিয়কে কন্যা দান করলে, কিংবা গৌণকুলীনের ও বংশজের কন্যা গ্রহণ করলে কুলীন বংশজে পরিণত হবে। কিন্তু সমাজ কালক্রমে এ বিষয়ে আরও একটু উদার হয়ে উঠলো। কৌলীন্যের নিয়ম ভাঙলে, তাঁরা ভঙ্গ কুলীনের মর্যাদা পাবেন। চার পুরুষ পর্যন্ত কৌলীন্যের অধিকারী বিবেচিত হবেন। বিশেষ করে তিন পুরুষ পর্যন্ত ভঙ্গকুলীনের বিয়ের বাজারদর বেশ চড়াই থাকতো। শ্রোত্রিয়, বংশজ এবং ভঙ্গকুলীনগণ ভঙ্গকুলীনকে কন্যাদান করা বেশ সম্মানের বিষয় বলে মনে করতেন। এই সুযোগে ভঙ্গকুলীন পাত্র নিজের কুলভাঙার ক্ষতিপূরণ হিসেবে নিজের দারিদ্র্য মোচন করতো চড়া অঙ্কের অর্থপণ নিয়ে। আর বহু সংখ্যক বিয়ে করে। সমাজের আর এক ব্যাধি, পণপ্রথা এভাবেই আক্রমণ শানাতে থাকে। বিবাহ একশ্রেণীর কাছে ব্যবসায়ে পরিণত হয়। অষ্টদশ শতাব্দীতে ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই সামাজিক ব্যাধি প্রকট আকার ধারণ করে। ঊনবিংশশতাব্দীর মাঝামাঝি শুরু হয় এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। আমাদের আলোচ্য রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) তারই প্রথম নাট্য প্রতিক্রিয়া।

৩০১.১.১.২ : ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজে কৌলীন্য প্রথার বিকটরূপ

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বিবাহ-ব্যবসা কুলীনদের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠলেও তা আরও উৎকট আকার ধারণ করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। কুলীনরা বিয়ে করার সময় এককালীন পণ যেমন নিতেন, পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যেই তাঁরা বিয়ে করতেন। নিজের ব্যয় নির্বাহের জন্য এরা শ্বশুর বাড়ি যেতেন। 'কুলমর্যাদা' অর্থাৎ নগদ টাকা হাতে না পেলে এঁরা শ্বশুরবাড়িতে বসতেন না, স্নানাহার কিছুই করতেন না।

স্ত্রীর সঙ্গে কথাও না বলে চলে যেতেন। অনেকদিন পরে কুলীন জামাই শ্বশুরবাড়ি এলে শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে প্রাণপণে খুশি করার চেষ্টা করতো। প্রথমে জামাইয়ের হাতে 'কুলমর্যাদা' হিসেবে যে অর্থ তুলে দেওয়া হতো, তাতে জামাই কখনো খুশি হতো, আবার খুশি হতোও না। রাতে শোওয়ার আগে জামাই স্ত্রীর কাছে টাকা চাইত। ১২৭৮ সালের পৌষ সংখ্যার 'বামাবোধিনী পত্রিকা' থেকে জানা যায় কুলীন স্ত্রীরা বছরের পর বছর চরকা কাটা টাকা জমিয়ে রাখতো স্বামীর মন পাওয়ার আশায়। তবুও স্বামীর মন টাকার পরিমাণ দেখে খুশি হতো না। প্রকৃতপক্ষে বিয়ে করাটা যখন জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে গণ্য হয়, তখন ব্যবসায়ীর মতো সবরকম বিবেক-বিবেচনা বিসর্জন দিয়ে কুলীন স্বামী লাভের জন্য স্ত্রীর সঙ্গে যে-কোনো অন্যায়ই করতো। পূর্বোক্ত পত্রিকার ১২৭৩ সালের ভাদ্র সংখ্যা থেকে জানা যায়, এক বালক তার চেয়ে বয়সে বড় তিন বোনকে এবং ১২৭৮ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে জানা যায়, অন্য এক বালক একই সঙ্গে তিন বোন এবং তাদের এক পিসিকে বিয়ে করে। অথবা ১২৭২ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা থেকে জানা যায় এক অতিবৃদ্ধ মৃত্যুর মাত্র সাতদিন আগে একটি বিবাহ করে।

আগেই বলেছি, টাকার লোভে যে কুলীনরা কুলক্ষয় করতো, বেশি সংখ্যায় বিয়ে করে তারা সেই কুলক্ষয়ের ক্ষতিপূরণ করে নিত। অপরপক্ষে অকুলীন কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিরাও এঁদের সন্ধানে থাকতো। ফলে বহু বিবাহের ব্যবসা রমরমিয়ে উঠেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে। ১৮৭১ সালে প্রকাশিত বহুবিবাহ গ্রন্থে বিদ্যাসাগর দুটি তালিকা প্রকাশ করেন। এ-তালিকায় নয়টি কুলীনের নাম পাওয়া যায় যারা পঞ্চাশ থেকে বিরাশিটি পর্যন্ত বিয়ে করেছিল। পঁচিশ থেকে চুয়াল্লিশটি বিয়ে করেছিল এমন চৌদ্দ জন এবং দশ থেকে তেইশটি বিয়ে করেছিল বাষট্টিজন। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর প্রকাশিত 'সমাচার দর্পন' পত্রিকা থেকে জানা যায়, বালিতে একজন কুলীনের মৃত্যুতে তার একশত স্ত্রী বিধবা হন। সব চেয়ে বেশি সংখ্যক বিয়ের কথা উল্লেখ করেছেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধায়। তিনি শুনেছিলেন এক ব্যক্তি ১৮০টি বিয়ে করেছিলেন। এ-সব প্রমাণ থেকে বলা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশে কৌলীন্যের ব্যাধি নানা সামাজিক সংকট সৃষ্টি করছিল — কখনো তা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার কন্যাকে পাত্রস্থ করার সংকট, কখনো বহুবিবাহ, কখনো পণপ্রথার সংকট। অবশ্য তার পরেও, বিংশ শতাব্দীর সীমাতেও সে ব্যাধির প্রতাপ কিছু পরিমাণে থেকে গিয়েছিল।

হিন্দুর শাস্ত্র মতে কন্যা 'অষ্টম বর্ষে গৌরী ভবেৎ' — অর্থাৎ আট বছরের মধ্যে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। তাই কন্যা একটু বড় হলেই অভিভাবকগণ মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠতেন। কিন্তু দেশাচার মতে অকুলীন পাত্রে কন্যাদান করা চলে না। আবার সমকক্ষ বা উচ্চতর বংশীয়ের হাতে কন্যাদান করতে হলে যে উচ্চ অঙ্কের পণ দিতে হয়, তারও সঙ্গতি নেই। আাবার কন্যাকে সারাজীবন অবিবাহিত রাখাও গুরুতর পাপকার্য। এ অবস্থায় অভিভাবকগণ বহু বিবাহিত কোনো কুলীন বৃদ্ধ বা মধ্যবয়স্ককে তাদের কন্যা বা একসঙ্গে কয়েকটি কন্যাকে বিয়ে করার অনুরোধ জানাতো অপেক্ষাকৃত অল্প পণে। এ ভাবে কুলীন পিতা-মাতা নিজেদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতেন। অন্যদিকে মৃত্যুপথযাত্রী কুলীনও বহু কন্যার পাণিগ্রহণ করে জীবনের অন্তিম পুর্ণ অর্জন করতো।

এই ধরনের বিবাহ পদ্ধতির ফলে কুলীন কন্যাদের শুধু অনূঢ়ত্ব ঘোচানো ছাড়া অন্য কোনো সান্ত্বনা লাভ হতো না। ঊনিশ শতকের সংবাদ-সাময়িক পত্রিকাগুলি থেকে জানা যায়, শুভদৃষ্টির পর কুলীন স্ত্রীর

সঙ্গে স্বামীর আর কোনোদিন দেখা হয়নি। আবার দেখা হলেও যথেষ্ট অর্থের অভাবে স্বামী-স্ত্রীর বাক্যালাপ হয়নি। এ জন্য কুলীন স্ত্রীরা, স্বামী থাকা সত্ত্বেও, বিধবার মতো জীবনযাপন করতে বাধ্য হতো। আবার প্রাপ্তবয়স্ক কুলীনকন্যা বিয়ে না হওয়ায় আত্মহত্যা করতো, অসম বয়সের বিবাহেও আত্মহত্যার চেষ্টা ঘটতো। বিয়ের পরে কুলীন কন্যাদের বেশির ভাগকেই পিতৃগৃহে দিন যাপন করতে হতো। সন্তানের জন্মদানও সেখানেই। ফলে তাদের জীবন পরগৃহে যাতনায়, অবহেলায়, নির্যাতনে ভরে উঠতো। K.M. Banerjee তাঁর The Kulin Brahmins of Bengal গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন, কৌলীন্যই ছিল 'Cruel engine of female misery and degradation'. আবার এই কৌলীন্য প্রথাই ছিল প্রকারান্তরে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজে অসংখ্য বিধবার দুঃসহ জীবন যাপনের মূল কারণ। মৃত্যুপথযাত্রী কুলীন এক সঙ্গে বহু কন্যার পাণিগ্রহণ করতো — ফলে সৃষ্টি হতো অসংখ্য বিধবা। ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধির মূলে ছিল এই কৌলীন্য প্রথা।

আবার কুলীন স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘকাল, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সারাজীবন স্ত্রীর দেখা হতো না বলে, সমাজের ব্যভিচারের ঘটনা ব্যাপক আকার ধারণ করে। এ বিষয়ে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত পাই ১৮৪২ সালের 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠি থেকে। চিঠিটি কোনো মহিলার লিখিত কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও বিষয়বস্তুর তৎসময়ের বাস্তবতায় সন্দেহ নেই। প্রকাশিত চিঠিতে এক কুলীন স্ত্রী জানিয়েছেন, তিন বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। ষোল বছর বয়সের সময় একদিন তাঁর স্বামী হঠাৎ এসে উপস্থিত হন। বৃদ্ধ, কুৎসিতদর্শন সেই স্বামী। কিন্তু তারই সঙ্গে তরুণী স্ত্রীকে সহবাস করতে হয়। এরপর স্বামীর সঙ্গে তাঁর আর দেখা হয়নি। কিন্তু যৌবনের স্বাদ পেয়ে তিনি আর সৎ থাকতে পারেননি। এ ধরনের ব্যাভিচারের ফলে অবৈধ গর্ভসঞ্চারের ঘটনা ঘটতো ব্যাপকভাবে। কখনো বহু অর্থমূল্য দিয়ে স্বামীকে স্ত্রীর সঙ্গে রাত্রিবাস করিয়ে গর্ভকে বৈধতা দেওয়া হতো। আবার কখনো গর্ভবতী আত্মহত্যা করতো বা বিষ খাইয়ে হত্যা করা হতো। আবার কখনো মিথ্যাচার করা হতো। কন্যার মা-বোনেরা সকালে রটনা করতো জামাই এসেছিল রাতে। কিন্তু কাজ থাকায় খুব ভোরে বেরিয়ে যেতে হয়েছে। এইভাবে জারজ সন্তানের সামাজিক বৈধতা সৃষ্টি হতো, অবৈজ্ঞানিকভাবে গর্ভপাতের ব্যবস্থাও ছিল — তাতে কখনো কখনো সন্তানসম্ভবার মৃত্যুও ঘটতো। মোটকথা এই কৌলীন্যপ্রথা সমাজকে নানাভাবে বিষাক্ত করে তুলেছিল। বেশ্যাপল্লীগুলিও রমরমিয়ে উঠছিল ঘর থেকে বেরিয়ে আসা ব্যাভিচারী কুলীন স্ত্রীলোকের দৌলতে।

৩০১.১.১.৩ : কৌলীন্যপ্রথা ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক প্রতিক্রিয়া

১৮৫০-এর আগে কৌলীন্যপ্রথা নিয়ে কোনো সামাজিক আন্দোলনের নজির আমরা পাইনা। কৌলীন্য ও বহুবিবাহ নিয়ে মিশনারীরাই প্রথম বিরুদ্ধ প্রচারে নামেন। পরে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভা এ-নিয়ে আলোচনা করলেও কোনো আন্দোলন সংগঠিত হয়নি। ইয়ং বেঙ্গলেরা তাদের পত্রপত্রিকায় কৌলীন্য ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেও আন্দোলন সংগঠিত করেনি। তবে এই সব আলোচনা থেকে জনমত একটা গড়ে উঠছিল। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বরে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' থেকে জানা যায়, দেশের মানুষ কৌলীন্যপ্রথা বিলোপের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছিল —"....হিন্দুরা এই অনুমান করেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে রাজাজ্ঞাক্রমেতে যেমন এই নিয়ম স্থাপিত হয় তেমন বর্তমান দেশাধিপতির অজ্ঞাতেও

তাহা স্থগিত হইতে পারে।" তবে এ বিষয়ে 'সমাচার দর্পণ' - এ একটা দ্বিধার কথাও ব্যক্ত হয়েছিল। সমকালীন সরকার প্রজাদের 'দুঃখ রহিত' ও 'সুখের বৃদ্ধি' করতে চেষ্টা করলেও কৌলীন্যপ্রথা রদে "...এই আশঙ্কা যে উক্ত ব্যবহার দেশের মধ্যে এমত বদ্ধমূল হইয়াছে যে তাহার একেবারে সমূলোৎপাটন করা অসাধ্য এবং আমাদের বোধ হয় এতদ্বিষয়ে অনেক ব্যাঘাত আছে।"

কিন্তু এই ব্যাঘাত সত্ত্বেও সরকারের সাহায্যে বহুবিবাহ রদ করার কথা সেদিন সমাজ যে ভাবতে শুরু করেছিল, ইতিহাস হিসেবে এইটিই গুরুত্বপূর্ণ। কৌলীন্য এবং তার হাত ধরে বহুবিবাহসহ আরো বহু সামাজিক সমস্যায় সেদিনের সমাজ জর্জরিত হয়ে উঠছিল। এক কুলীন বহু কন্যার পাণিগ্রহণ করায় অন্য ব্যক্তির পক্ষে বিবাহ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এই সব বাস্তব অবস্থার কথা ভেবে সেদিন মানুষ রীতিমতো চিন্তিত হয়ে উঠেছিল এবং তার প্রতিকারের কথা ভাবছিল। এই ভাবেই তৈরী হচ্ছিল সংগঠিত আন্দোলনের পথ।

আমরা জানি, দেশের শিক্ষিত ও সচেতন মানুষ বহুবিবাহের বিরুদ্ধে প্রথম সরকারের কাছে আবেদন করেন ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু সমাচার দর্পণে তারও বহু আগে বিষয়টির প্রয়োজনীয়তার কথা উঠে এসেছে। পরবর্তীকালে দেশের মধ্যে এই মনোভাব আরো বেশি সোচ্চার হয়ে ওঠে। এ-নিয়ে আপামর জনসাধারণ বহুবিবাহের সামাজিক সমস্যা নিবারণের জন্য সরকারের কাছে আবেদনে আগ্রহী হয়ে উঠলেন (সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র- (৩য়) বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, ১৯৬৪ পৃ. ৫৭১)

বহুবিবাহের বিরুদ্ধে যাঁরা ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কিশোরীচাঁদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামাপ্রসাদ রায় প্রমুখের নাম করতে হয়। ১৮৫৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর সরকারের কাছে বহুবিবাহ রদের আবেদন জমা পড়ে। কিন্তু বহু বিবাহের পক্ষেও সেদিন আবেদন করা হচ্ছিল নানা দিক থেকে। তবে বর্ধমানের রাজা সহ বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি ও বিদ্যাসাগরের স্বাক্ষরিত বহুবিবাহ রদের আবেদন পত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই আন্দোলনের অংশ হিসেবে রমাপ্রসাদ রায় বহুবিবাহ নিরোধক একটি বিলের খসড়াও তৈরী করেছিলেন। সরকারের পক্ষ থেকে গ্রান্ট এটিকে আইন হিসেবে পাশ করার আশাও দিয়েছিলেন। কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহের ফলে সরকার আর এ বিষয়ে আগ্রহী হয়নি।

সমস্যাটি নিয়ে কয়েকবছর পরে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য দেবনারায়ণ সিংহ আবার তোড়জোড় শুরু করেন। কিন্তু তিনি সদস্য থাকতে থাকতে যে বিল উত্থাপন করতে পারেননি। খসড়া বিল সহ তিনি এ বিষয়ে সরকারের কাছে আবেদন করেন ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে সে-বছর আরো বহু আবেদন এই বিষয়ে জমা পড়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সিসিল বীডনের কাছে। কিন্তু বিডন তখন কিছুই করতে পারেননি।

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ বহুবিবাহ প্রথা লোপের আন্দোলনে একটি উল্লেখযোগ্য বছর। এ বছরের প্রথম মাসে রাজা রাধাকান্ত দেব বহুবিবাহ প্রথার পক্ষে সরকারের কাছে একটি আবেদন পত্র পাঠান। ১৮৬৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বহুবিবাহ রদের জন্য পাঠানো হয় আর একটি আবেদন পত্র। মহারাজ সতীশচন্দ্র ও অন্যান্য ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্র ডেপুটেশনের মাধ্যমে লেফটেনেন্ট গর্ভনর বীডন সাহেবের হাতে দেওয়া হয় ১৯ মার্চ, ১৮৬৬। বীডন সাহেবের আবেদন

সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করে আইনে পরিণত করার আশ্বাসও দেন। এরপর বর্ধমানরাজের স্বাক্ষরসহ আরো একটি আবেদনপত্রও জমা দেওয়া হয়। তাই এই ১৮৬৬ সালকে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়নের দাবিতে যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বছর হিসেবে আমরা উল্লেখ করছি।

বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনে 'সনাতন ধর্মরক্ষিনী সভা'র ভূমিকাও ছিল সদর্থক। বিদ্যাসাগর এই সভাকেই সাহায্য করতে রচনা করেছিলেন বহুবিবাহ সংক্রান্ত তাঁর প্রথম পুস্তক। সোমপ্রকাশের পৃষ্ঠায় বহু ব্যক্তির মতামতের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বাদবিতণ্ডা জমজমাট হয়ে ওঠে এবং বহুবিবাহ সংক্রান্ত আন্দোলন তীব্রতা লাভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশক বহুবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে বাদবিতন্ডায় সংক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আবার এই আন্দোলন কেবল দেশের রাজধানী কলকাতাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল না পূর্ববঙ্গে কুলীন হওয়া সত্ত্বেও রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় নেতৃত্বে সংগঠিত হচ্ছিল বহুবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথা বিরোধী আন্দোলন। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই আন্দোলন সফল হয়নি। এর প্রধান কারণ বিদেশী শাসক সিপাহি বিদ্রোহের পরে আর এদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। তাছাড়া কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহপ্রথা রদের ব্যাপারে সমাজের সর্বাংশের মানুষ সাড়া দেয়নি। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ কৌলীন্যের ও বহুবিবাহের ভয়াবহতা নিয়ে উদ্বিগ্ন হলেও আর্থিক ক্ষতি নিশ্চিত জেনে এ-পথে পা বাড়াননি। ফলে এই আন্দোলন শেষপর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি।

৩০১.১.১.৪ : কৌলীন্যপ্রথা বিরোধী প্রথম প্রহসন 'কুলীনকুলসর্বস্ব'

আমরা আগের আলোচনায় লক্ষ করেছি, ১৮৫৪ সালে প্রথম সরকারের কাছে কৌলীন্যপ্রথার বহুবিবাহ রীতি রদ করার জন্য আবেদন জমা পড়ে। এ-নিয়ে তখনো কোনো সামাজিক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু এ বছরই রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনা করেন বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নামের এক নাটক। কেউ আবার একে সামাজিক রঙ্গচিত্র কিংবা সামাজিক নাটক হিসেবেও অভিহিত করেছেন। যে নামেই কুলীনকুলসর্বস্বকে চিহ্নিত করিনা কেন, তার প্রহসনধর্মী বৈশিষ্ট্যকে আমরা কেউ-ই অস্বীকার করতে পারবো না। এই বিষয় নিয়ে রামনারায়ণের আগে অন্য আর কোনো নাট্যপ্রচেষ্টা ছিল না। কিন্তু নাট্যবিষয় কিংবা নাটকের নামকরণ — কোনোটিই নাট্যকারের নিজস্ব উদ্ভাবনা নয়। আগের আলোচনায় দেখেছি, কৌলীন্য প্রথার বিষ সমস্ত সমাজ-জীবনকে তিক্ত করে তুলছিল। পত্র-পত্রিকা বা অন্যভাবে তার প্রকাশও ঘটছিল নানা ভাবে। এই পরিস্থিতি ১৮৫৩ সালে রংপুরের কুন্ডী গ্রামের জমিদার কালীচরণ চৌধুরী 'সম্বাদ ভাস্কর'- সহ অন্যান্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন, কৌলীন্যপ্রথাহেতু কুলীন কামিনীগণের যে দুর্দশা ঘটেছে, সে বিষয় 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নামে একখানি নাটক রচনা করে, রচয়িতাদের মধ্যে যিনি সর্বোৎকৃষ্টতা প্রমাণ করতে পারবেন, তিনি তাঁকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দেবেন। সুতরাং এ নাটকটি যে তীব্র কোনো সামাজিক আন্দোলনের কারণে রচিত হয়েছে, এমন নয়। আবার নাট্যকারের আত্মপ্রেরণার ফল হিসেবেও এ নাটক রচিত হয়নি। বাইরে থেকে এক উদ্দেশ্যমূলকতার চাপই প্রহসনটির জন্মমূলে বর্তমান।

৩০১.১.১.৫ : উদ্দেশ্যমূলক নাটক হিসেবে কুলীনকুলসর্বস্ব

'কুলীনকুলসর্বস্ব' আস্বাদনের অবকাশে আমরা একটি শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হই। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে পাশ্চাত্যে সাহিত্য সম্পর্কে একটি মতবাদ প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিশেষ করে রোম্যান্টিক যুগের জার্মান লেখকগণ, যাঁদের মধ্যে কান্ট, শেলিং, গ্যেটে, শিলার প্রমুখ ছিলেন— তাঁরা সকলেই মনে করতেন শিল্পের ক্ষেত্রটি অন্যনিরপেক্ষ স্বশাসিত এক বিষয়। শিল্পেই শিল্পের পূর্ণতা। তা কোনো তত্ত্বের প্রতিপাদন করবে না, কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য তার থাকবে না, কোনো নৈতিক শিক্ষাও তার কাছ থেকে পাওয়ার নয়। আবার অস্কারওয়াইল্ডও এ তত্ত্বের প্রবল সমর্থক ছিলেন।

কিন্তু আমাদের দেশে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে রামনারায়ণ 'কুলীনকুলসর্বস্ব' রচনার মধ্যদিয়ে সামাজিক সমস্যার নাট্যরচনায় যখন আবির্ভূত হলেন, তখনো প্রবল কোনো আন্দোলন কৌলীন্যপ্রথাকে ঘিরে গড়ে ওঠেনি। ফরমায়েসী রচনা হিসেবে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' রচিত হলেও সামাজিকবর্গ এটিকে সাদরে গ্রহণ করেছিল এবং এটির একাধিক সংস্করণ মুদ্রিতও হয়েছিল। এখানেই নাটকটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব। কুলীনকুলসর্বস্বের উদ্দেশ্যমূলকতা নিয়ে কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। এর উদ্দেশ্য নিয়ে নাট্যকার কোথাও কোনো রাখঢাক করেননি। প্রহসনের বিজ্ঞাপনেই রামনারায়ণ কালীচন্দ্র রায়ের ঘোষিত পঞ্চাশটাকা পুরস্কারের কথা জানিয়েছেন। কাহিনীর উদ্দেশ্যমূলকতার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, নাটকটি ছয় ভাগে বিভক্ত। প্রথমে কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় মেয়েদের বিবাহ অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় অংশে ঘটকের কপট ব্যবহারের রহস্যজনক উপস্থাপন ও নানা প্রস্তাব। তৃতীয় অংশে কুল-কামিনীদের আচার-ব্যবহার। চতুর্থ অংশে শুক্রবিক্রয়ীর দোষনির্দেশ। পঞ্চম অংশে নানা রহস্য ও পঞ্চাননের বিয়োগ বা বিয়োগ ব্যথার বর্ণনা। ষষ্ঠ অংশে বিবাহ নির্বাহ। এই বর্ণনাক্রমকে সামনে রেখে নাট্যকার যা করতে চেয়েছেন তা লেখকের নিজের কথাতেই যেতে পারে — "ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপর্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম কৌলীন্য প্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া যাইতে পারে।" কাজেই লেখকদের কাহিনী রচনার পেছনে যে উদ্দেশ্য, তা সমাজের এক দুরবস্থা সম্পর্কে পাঠকের চেতনাকে উদ্বোধিত করা — এ বিষয়ে কোনোমাত্র সন্দেহ থাকে না।

লেখকের চরিত্র-চিত্রণ থেকেও উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা অনুভব করা যায়। নাট্যচরিত্রগুলি — কুলপালক, বিবাহ-বণিক, অধর্ম-রুচি, উদরপরায়ণ, অভব্যচন্দ্র। এইসব চরিত্রের নামকরণ থেকেই বোঝা যায় নাটকের স্পষ্ট উদ্দেশ্য। উপকাহিনীগুলোও উদ্দেশ্য নিয়েই সৃষ্টি। কুলপালকের চারটি মেয়ের বিবাহ সমস্যা নিয়ে মূল কাহিনী গঠিত। কিন্তু ফুলকুমারী, বিবাহ বণিক প্রভৃতির কাহিনীও কৌলন্যপ্রথার বিষ-পরিণামকে উদঘাটিত করেছে। এতে রামনারায়ণ সমাজের বাল্যবিবাহের মতো সমাজ-সমস্যাগুলিকেও আক্রমণ করেছেন। এছাড়া অর্থলোভী ঘটকদের নীচতা, ব্রাহ্মণদের ঔদরিকতা পুরোহিতদের মুর্খতা প্রভৃতিকেও রামনারায়ণ রঙ্গ-রসের ভিয়েনে চাপিয়ে আমাদের কাছে পরিবেশন করেছেন। বিবিধার্থ সংগ্রহে (মাঘ, ১৭৭৬ শকাব্দ) রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন "তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় পরম চাতুর্যের সহিত সামান্য বিবাহের উদ্যোগে অনেকগুলি প্রসঙ্গ একত্রিত করিয়া অনেক ব্যক্তির চরিত অতি পরিপাটি রূপে বিন্যস্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে কন্যাকর্তা কুলপালকই প্রসঙ্গ

বিধায়ে সর্ব্বপ্রধান; তাহার বর্ণনা পাঠে কন্যাদিগের দুঃখে অথচ কুলাভিমান রক্ষার্থে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কন্যাভারগ্রস্ত কুলীনের মূর্ত্তি মনের মধ্যে অবিকল উদিত হয়, কোনো অংশে কিছু মাত্র ত্রুটি বোধ হয় না।.....যশোদা ও ফুলকুমারীর কথোপকথনে যে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে এমত পাষাণহৃদয় কেহ নাই, যে একবারে মহাপাপীয়সী কৌলীন্যপ্রথার উৎসেদার্থে একাগ্রচিত্ত না হয়; তদুক্ত জামাতার ন্যায় নরাধম কি ভূমন্ডলে আর আছে।" 'প্রবাসী' পত্রিকায় (১ম খণ্ড, আশ্বিন, ১৩৩৮) প্রিয়রঞ্জন সেন এই প্রহসনটি সম্পর্কে একটি চমৎকার মূল্যায়ন করেছেন। তিনি বলেছেন, নাটকটি পড়ে তাঁর অনেক কথা মনে হয়েছে। এতে হাস্যরসের উপাদান এত প্রচুর যে, কুলীন কুলের দুঃখদৈন্য দুর্দ্দশার ছবিই শুধু লেখকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, কৌলীন্য ব্যবস্থায় মধ্যে যে প্রচন্ড অসঙ্গতি রয়েছে, তা দেখে তর্করত্নমহাশয় হাস্যসম্বরণ করতে পারেননি। কুলসর্বস্ব কুলীনের ব্যাখ্যা নাট্যকার করেদিয়েছেন — 'কু'তে লীন, কুলীন, অর্থাৎ কুক্রিয়াসক্ত। তাই সমালোচকের মতে, আর অনুকম্পা করবেন কাকে, দুঃখবোধ করবেন কার জন্য? সমালোচক সেনের আরও কথা— "গ্রন্থকার নিজে ছিলেন দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, — বল্লালী প্রথার সহিত তাঁহার সমাজের কোনোও সম্পর্ক ছিল না, তিনি তাঁহার অধীন ছিলেন না, তাই বোধ হয় তাঁহার দৃষ্টি খুলিয়াছিল ভাল — বংশগত কুসংস্কারে মলিন হয় না।"

কিন্তু আমাদের ধারণা, আপন সমাজের সঙ্গে বল্লালী প্রথার সম্পর্ক না থাকাটাই রামনারায়ণের কৌলীন্য বিরোধী রচনার একমাত্র দৃষ্টি উন্মোচনকারী কারণ নয়। এর পেছনে আরো একাধিক কারণ থাকাটাই স্বাভাবিক। যে বাস্তবতার বোধ, লেখকের আন্তরিকতা ও পরিবেশনের স্বতঃস্ফূর্ততা পাঠক সমাজকে মুগ্ধ করেছিল তা রামনারায়ণের নিজেরই প্রতিভার শক্তি। আবার কৌলীন্য বিরোধী মনোভাব রামনারায়ণ কেবল নিজের মস্তিষ্কপ্রসূত প্রেরণা বলেই লাভ করেননি, এর পেছনে নিজের হৃদয়-প্রেরণাকেও অস্বীকার করা যাবে না। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় যথার্থই বলেছেন, 'এই বিষয়ের প্রতি লেখকের সহানুভূতি ও এই বিষয়ে তাঁহার প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা না থাকিলে যেমন তাঁহার রচনার পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যতাও হইত না, তেমনি ইহা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও কোনো স্থায়ী কীর্তিও রাখিয়া যাইতে পারিত না।" এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক ড. অজিতকুমার ঘোষের আর একটি মন্তব্যকেও আমরা সমচিত ভেবে রামনারায়ণের এই সামাজিক নাটক রচনার কারণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। তিনি 'রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনাবলী'র ভূমিকায় লিখেছেন — "কেন রামনারায়ণ সামাজিক নাটক রচনা শুরু করলেন... গৌণ কারণ হল, পুরস্কার প্রাপ্তির আশা।....কিন্তু সামাজিক নাটক লেখার মুখ্য প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর প্রগতিশীল সমাজভাবনা এবং বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত প্রবল সমাজ আন্দোলন থেকে। রামনারায়ণ বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব, উদার প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী ও সমাজসংস্কার-প্রচেষ্টার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় বিদ্যাসাগরের ছাত্র (সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকাল ১৮৪৩-১৮৫৩) এবং বিদ্যাসাগরের অধীনে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক ছিলেন (অধ্যাপনা কাল ১৮৫৫-১৮৮২)।" মোটকথা রামনারায়ণ যে শিল্পের জন্য তত্ত্ব থেকে তাঁর নাটক রচনা করেননি, বহুমুখী সমাজ সমস্যার মুখে দাঁড়িয়ে, তাকে রঙ্গরসের ভিয়ানে চাপিয়ে সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যকে হৃদয়ে লালন করে নাটকটি রচনা করেছেন এতে সন্দেহমাত্র নেই।

৩০১.১.১.৬ : কুলীনকুলসর্বস্ব কাহিনী — বহুমাত্রিক সমাজ-সমস্যার চিত্রশালা

বন্দ্যঘটীয় কেশব চক্রবর্তীর বংশধর কুলীন ব্রাহ্মণ কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চার মেয়ে — জাহ্নবী, শান্তবী, কামিনী ও কিশোরীর বিবাহ সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে এ নাটক। ক্রমানুসারে মেয়েদের বয়স ৩২-৩৩, ২৬-২৭, ১৪-১৫ ও ৮। মেয়েদের বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাওয়ায় কুলপালক চিন্তিত ও সমাজ-নিন্দিত। কিন্তু যথাযোগ্য কুলীন পাত্র না পেলে তো আর মেয়েদের বিয়ে দেওয়া যায় না। তাছাড়া কুলপালক মনে করেন, 'বিবাহ নির্বাহ বিধির ঘটনা'। কিন্তু এ ভাবে শান্তিতেও থাকা যায় না। চিন্তাগ্রস্ত হয়ে তাঁর নিজের কথা — "আমি কন্যাভারগ্রস্ত হইয়া রাহুগ্রস্ত দিনকরের ন্যায় চিন্তায় ক্ষীণকায় হইতেছি; কুলকুণ্ডলিনী কবে আমাকে কুলে আনিবেন : কবে কুল রক্ষা করিবেন।"

দু'জন ঘটক — শুভাচার্য ও অনৃতাচার্য কুলপালকের মেয়েদের বিয়ের দায়িত্ব নিয়েছে। এদের মধ্যে শুভাচার্য শুভবুদ্ধি সম্পন্ন, ন্যায়নীতির দ্বারা চালিত হয়। কিন্তু অনৃতাচার্য স্বার্থপর, মূর্খ, নীতিহীন, হীনপ্রতারক। অনেক স্পষ্ট স্বীকার করে তিনি কুলপালকের মেয়েদের জন্য একটি ভাল পাত্রের সন্ধান নিয়ে এসেছেন, সে আবার 'বিষ্ণুঠাকুরের বংশোৎপন্ন, ফুলের মুখোটী।' পাত্রের গুণের শেষ নেই, বয়সও বেশি নয় — মাত্র ষাট। ঘটকের পরামর্শে নগ্ন না থাকলেও তাড়াহুড়ো করে বিয়ের দিন ঠিক করা হল। আশঙ্কা, পাছে পাত্র হাতছাড়া হয়ে যায়।

কুলপালকের স্ত্রী মেয়েদের বিয়ের কথা শুনে খুশিতে মেয়েদের ডাকাডাকি শুরু করেন। খবর শুনে বড় মেয়ে জাহ্নবী বলে, আর কতকালই বা সে বাঁচবে, বুড়ো বয়সে কেন এসব 'ধেড়ে রোগ'। মেজো মেয়ে চাপা ক্রোধে বলে, 'ও মা তুই কি কুল রক্ষা কর্ব্যি, তবে জাতি রক্ষা কে কর্ব্যে মা?' সেজো মেয়ে মায়ের কথা বিশ্বাসই করতে চায়না। কারণ এর আগে অনেক বার এ কথা বলে ছলনা করা হয়েছে। ছোট মেয়ে পাড়ায় খেলা করছিল। খবর শুনে সেও ছুটে এলো। জানতে চাইল, বিয়ে কাকে বলে মা? 'তাকি আমি খাব?'

বিবাহের আয়োজন চলতে থাকে — পাড়ার প্রতিবেশিনীরা জমতে থাকে — ভীড় জমে পুরোহিতদের। আবার কন্যাদের প্রতিক্রিয়া জানা যায়। জাহ্নবীর প্রশ্ন — 'এখন আইল পাষ্ট সন্তাপ পাইয়া। উহাকে শীতল তবে করিব কি দিয়া।' শান্তবী সামান্য আশাবাদী। সে বলে, 'হোক্‌না দেখা যাক।' কামিনী ও কিশোরী বয়সোচিত কৌতুহলে বর দেখতে ছুটে যায়। ফিরে আসে নিরাশ হয়ে। শান্তবীর প্রশ্নের উত্তরে কামিনী বরের কথায় জানায় — 'তামাক টানিতে মরে কাশিতে কাশিতে। বোধ হয় হয় গয়া এবার কাশিতে।' এবার সকলে মিলে পিতার কাছে আপত্তি জানাবে বলে শান্তবী প্রস্তাব দেয়। কিন্তু এ সময়ে এমন প্রস্তাব কোনো লাভ হবে না তারা বুঝতে পারে। বিয়ের আসরে বরকে আরো ভালভাবে দেখা যায়। পুরোহিত ধর্মশীল ও ঘটক অনৃতাচার্যের মধ্যে যে বরের রূপগুণের আলোচনা হয়, তা থেকে জানা যায় — 'দেখিতে সুন্দর বর দাদ সবগায়।' আর বসন্ত রোগে তার এক চক্ষু নষ্ট হয়ে গেছে — 'দক্ষিণ নয়ন কেন দেখিতে না পাই।' কিন্তু তবুও বিয়ে হল। কুলপালক এই কুলীন বরের হাতেই একসঙ্গে নিজের চার মেয়েকে সপে দিল নিজের কুলমর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে। কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য তার বাস্তবতা গুণ। কিন্তু শুধু বাস্তবতার অনুসরণে নাটকের কোনো

চরিত্র সার্থকতা লাভ করতে পারে না। সাহিত্যতো ফটোগ্রাফি নয়। সাহিত্যে চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলতে বাস্তবতাকে ভিত্তি করতে নিশ্চয়ই কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবতাটাই সাহিত্য নয়। তার জন্য প্রয়োজন শিল্পীর গভীর জীবনরস-রসিকতা।

এই নিরিখে কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকে আমরা যে-সব পুরুষ চরিত্র পেয়েছি তাদের মধ্যে প্রায় সব চরিত্রই সমাজবাস্তবতার কোনো-না-কোনো একটি দিক সম্পর্কে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। যেমন কুলপালক, কুলধন, শুভাচার্য, সুধীর, অনৃতাচার্য, ধর্মশীল, তর্কবাগীশ, অধর্মরুচি, বিবাহবণিক, উদর-পরায়ণ, বিরহী-পঞ্চানন, বিবাহ-বাতুল, অভব্যচন্দ্র প্রভৃতি। কৌলীন্যপ্রথার বাস্তাবতাকে, এই সব চরিত্রের নামকরণের মধ্যে যে-সব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, নাট্যকার সেগুলির একান্ত বিশ্বাসযোগ্য রূপায়ণ ঘটিয়েছেন নাটকে। কিন্তু এরা শিল্পীর সহানুভূতিতে কেউই প্রায় সিঞ্চিত হয়ে ওঠেনি। হয়তো এর মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রম কুলপালক।

কুলপালকের চরিত্রই এ নাটকে প্রধান পুরুষ চরিত্র। রাজেন্দ্রলাল মিত্র যথার্থই বলেছেন "...কন্যাকর্ত্তা কুলপালকই প্রসঙ্গবিধায়ে সর্ব্বপ্রধান; তাহার বর্ণনা পাঠে কন্যাদিগের দুঃখে দুঃখিত অথচ কুলাভিমান রক্ষার্থে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কন্যাভারগ্রস্ত কুলীনের মূর্ত্তি মনের মধ্যে অবিকল উদিত হয়, কোনো অংশে কিছুমাত্র ত্রুটি বোধ হয় না।" বল্লাল সেনীয় কৌলীন্য প্রথার প্রকোপে বাঙালী হিন্দু সমাজে যে ভয়ঙ্কর অধোগতি নেমে এসেছিল, ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত যার বিষময় ফল সমাজে পুরোমাত্রায় বর্তমান ছিল, তারই একটি বাস্তব ও হৃদয়বিদারক চিত্র নাটকটিতে ফুটে উঠেছে। এই প্রথার যূপকাষ্ঠেই কুলপালক তাঁর চারটি মেয়েকে একই সঙ্গে বলি দিয়েছেন। নিরুপায়ভাবেই তাঁকে এ কাজ করতে হয়েছে। যে সমাজ কেবল প্রথার দাসত্ব করে, সে সমাজে মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের অবকাশ থাকে না। কুলপালক যা করেছেন, তা জগতে কোনো পিতারই কাম্য হতে পারে না। কুলপালকওতো তা চাননি। কিন্তু এই প্রথাকে লঙ্ঘন করে বিরুদ্ধে যাওয়ার মতো ক্ষমতাও ব্যক্তিবিশেষের সব সময় থাকেনা — কুলপালকেরও ছিল না। এখানেই কুলপালকের জীবনের ট্র্যাজেডি। ছাত্র তর্কবাগীশের সঙ্গে ধর্মশীলের আলাপ আলোচনাকালে এই সত্যটিকেই তুলে ধরেছেন — "আমার যজমান কুলপালক বাঁড়ুয্যে, তিনি বল্লালকৃত কুলকল্লোলে পতিত; তাঁহার চারিটি কন্যা; তন্মধ্যে কনিষ্ঠ কন্যাটির কেবল কন্যা কাল আছে, তৃতীয়টি যুবতী, দ্বিতীয়া আর জ্যেষ্ঠা তারা অনূঢ়াবস্থায়ই যৌবনযাপন করিয়াছে। তিনি এতাবদিবস সমযোগ্য কুলীন বর প্রাপ্ত হন নাই। কুলভঙ্গ ভয়ে তাহাদের বিবাহ দিতেও পারেন নাই।"

নাটকের সূচনায় কুলপালককে দেখা যায় 'কন্যাভারগ্রস্ত' হয়ে তিনি বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন। তিনি প্রায় অসুস্থ। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হওয়া মেয়েদের কথা ভাবতে গিয়ে তিনি বলেন — 'বিবাহ নির্বাহবিধি — বিধির ঘটনা'। কিন্তু এ তো তার বিশ্বাসের উৎস থেকে যতটা উৎসারিত আত্মকথন, তার চেয়েও বেশি তার জীবনযুদ্ধে পরাজিত হওয়ার যন্ত্রণা থেকে উচ্চারিত। সমাজ-শক্তির কাছে পরাজিত দুর্বল ব্যক্তিসত্তার গূঢ় অভিব্যক্তি। আবারও তাঁকে বলতে শুনি — আমি বন্দ্যঘটীয় কেশব চক্রবর্তীর সন্তান, প্রধান কুলীন, আমার কন্যাদিগের বিবাহ হয় নাই।' এই উক্তিরও ব্যঙ্গার্থ আত্মশ্লাঘার ঘোষণা নয়, দুর্বিসহ কৌলীন্য প্রথার প্রতি ধিক্কার জ্ঞাপন। কথাটা আরও স্পষ্ট করে তিনি বলেন —'...আঃ পোড়া দেশীয়দিগের কি দুরন্ত প্রথা! অতি মন্দ অতি মন্দ, এমন দেখিনাই।' কিন্তু সেদিনের সমাজে কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে কুলপালকের মতো ব্যক্তির বিক্ষুব্ধ মন বিদ্রোহের পথ খুঁজে পায়নি। পরাজিত অসমর্থ কুলপালক তাই শেষপর্যন্ত

আত্মসমর্থনের গলিঘুঁজি খুঁজে বেড়ায়। প্রতিবেশী কুলধনের কাছে তাই নিজের দুর্ভাগ্যের সমর্থনে যুক্তিজাল বিস্তার করে বলে — "আমার মেয়েদের বিবাহ হইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে, তা এমন কি কারু হয় না, ...তা বিলম্বই বা কি, বৈদিক ব্রাহ্মণের ন্যায় কি গর্ভে গর্ভে বিবাহ দিব? দেশের লোকেরা তাহা বিবেচনা করে না, নিরপরাধে আমাকে নিন্দাবাদ প্রদান করিতেছে।' এই অস্থির অসুস্থ মানসিকতা নিয়েই পিতা কুলপালককে ষাট বছরের এক বৃদ্ধ কুলীন বর, যার সর্বাঙ্গে দাদ, মুখে বসন্তের দাগ এবং ডান চোখে কানা— তারই সঙ্গে চারটি মেয়ের বিয়ে দিতে হয়েছে। এই যে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমাজ-শক্তির জবরদস্তি — এবং সেই জবরদস্তিতে রক্তাক্ত হৃদয় কুলপালক বাস্তবের তথ্য থেকে নাটকের ট্রাজিক চরিত্রে পরিণত হয়েছে। এঁর জন্য সামাজিকবর্গের গভীর সহানুভূতি জাগ্রত হয়।

কুলধন চরিত্রটি এ নাটকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আবির্ভূত হলেও সে মানসিকতায় কুলপালকের মতোই। তাকেও কৌলীন্যপ্রথার বিষবাষ্পে আহত হতে হয়েছে। কুলধন মুখোপাধ্যায় কুলপালকের প্রতিবেশী — পরস্পর পরস্পরের সমব্যথী। এই বিবেচনায় কুলপালক নিজের মেয়েদের যথাসময়ে বিয়ে দিতে না পারার জন্য কুলধনের সমর্থন খোঁজে — ভাই তুমি বিবেচনা করো দেখি সময়োগ্য পাত্র না পাইলে' 'যার তার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে চিরন্তন কুলে জলাঞ্জলি দিব?' দেশাচারের নিন্দা করেও তার বিরুদ্ধে এঁরা বিদ্রোহ করতে পারেন না। কুলীনকুলধন মুখোপাধ্যায়ও সমব্যথীর কাছে নিজের মর্মবেদান প্রকাশ করে নিজের মেয়ের বয়স সম্পর্কে বলেন, — 'বয়েস বড় অধিক নয়, সেদিন ঠিকুজি খুলিয়া দেখিলাম, বলি দেখি মেয়েটার বয়েস কত, তা ভাই বুঝিতে পারিলাম না, ঠিকুজিখানা জীর্ণ হয়েছে, আঁকর বোঝা যায় না, তা নাই গেল, সে তার বড় পিসীর বইসী'। তাই কুলপালকের মতোই পিতা কুলধনকেও কৌলীন্যপ্রথার দেশাচারে সমান ভাবেই পীড়িত হতে হচ্ছিল।

অধর্মরুচি চরিত্রটি সেদিনের কৌলীন্যপ্রথাকে কেন্দ্র করে সমাজের বাস্তবকে নানা মাত্রায় আমাদের সামনে প্রত্যক্ষবৎ করে তুলেছে। কিন্তু পূর্বে আলোচিত কুলপালক ও কুলধন চরিত্র দুটি সমাজ-শাসনের যূপকাষ্ঠে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেমন নিরুপায় ভাবে আত্মসমর্পনে বাধ্য হয়েছে এবং সে কারণে লেখক ও পাঠক উভয়ের কিছুপরিমাণে হলেও সহানুভূতি আকর্ষণে সফল হয়েছে, এ চরিত্রটি এবং অন্যান্য পুরুষ চরিত্রগুলি, তেমন নয় নিরঙ্কুশ ভাবে কৌলীন্য প্রথার ও আনুষঙ্গিক নানা সামাজিক সংকটের বিষ এরা বহন করেছে এবং লেখক ও পাঠকের সহানুভূতি থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়েছে। তাই সামাজিক সমস্যার তথ্যকে নিপুনভাবে ধারণ করেও এ চরিত্রগুলি চরিত্র হিসেবে রক্ত-মাংসের সজীবতা অর্জন করতে পারেনি। অধর্মরুচি এই ধরনের চরিত্রগুলির মধ্যে প্রধানভাবে আলোচ্য। বিবাহ-বণিক অধর্মরুচির পিতা। তাকেও একই সঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখতে হয়। কারণ পিতা-পুত্র উভয়ে মিলে চরিত্রের একটি বিশেষ টাইপকে আমরা প্রত্যক্ষ করি।

কৌলীন্য প্রথার সুযোগ নিয়ে কোনো কোনো কুলীন বিবাহকে একটি লাভজনক ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। 'বিবাহ-বণিক' নামটির মধ্যেই চরিত্রের বিবাহ-ব্যবসায়ী স্বরূপটি ধরা পড়েছে। ছাত্র তর্কবাগীশকে গুরু ধর্মশীল কুলীনদের সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে বলেছেন — কুলীন মহাত্মারা ধর্মাধর্মের প্রতি নেত্রপাত করেন না, অর্থ পাইলে পরমার্থ বোধে সকল দুষ্ক্রিয়াই করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বয়োবিবেচনা, গুণ পর্যালোচনা, সৌন্দর্যাভিলাষ, জাতি বিনাশশঙ্কা লোকাপবাদ ভয়, কিছুই নাই; অর্থলোভে

এক ব্যক্তি একশত পর্যন্ত পরিণয়ে প্রণয়বদ্ধ করেন, কাহার বা বিবাহ-ব্যাপারে আলস্য নাই।" এখানে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের কুলের লক্ষণ ঘটক অনৃতাচার্যের ভাষায় স্মরণ করা যেতে পারে —

দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে নিবাস শ্বশুর-ঘরে
মাদকেতে আমোদ বিস্তর।
সন্ধ্যার নাহিক গন্ধ গায়ত্রীর আট্‌ক্যা বন্ধ
সদানন্দ-পূর্ণ কলেবর।।
মুখে সদা বেরিগুড্ তুড়ি দিয়া বলে হুট্
হাস্য আস্যে দোষে সাধুজনে।
বড় ভক্তি পাঁচালিতে কে আঁটিবে বাচালিতে
এই নয় গুণ লও গণে।।

কুলীন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের এই চারিত্রিক টাইপটিকে পিতা বিবাহ-বণিক ও পুত্র অধর্মরুচির চরিত্রে নাট্যকার মূর্ত করে তুলেছেন।

বিবাহ-বণিক বহু সংখ্যক বিবাহ করেছেন। সেদিনের কুলীন ব্যক্তিরা যেমন সংখ্যাধিক্যের জন্য সব শ্বশুরবাড়ির কথা মনে রাখতে পারতো না বলে খাতায় লিখে রাখতো, বিবাহ-বণিকও তাই করতো। টাকার প্রয়োজন দেখা দিলে খাতা বের করতো এবং ঠিকানা মতো জায়গায় গিয়ে হাজির হতো। বিবাহ-বণিকেরও একদিন টাকার প্রয়োজন হল। তার স্বগতোক্তি — "আমার কিছু টাকা চাই, কোথা যাই, বেলাও অনেকটা হয়েছে, নিকটে কি কোনো শ্বশুরবাড়ি নাই? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, যেন মনে হচ্ছে, এখান হইতে এক ক্রোশ হইবে বিমলাপুর, সেখানে বুঝি একবার বে হয়েছিল। (চিন্তা করিয়া) আমিই সেথায় বে করেছি না পুত্রের বে দিছি? ভাল মনে হচ্ছে না, — পুত্রকে ডেকে জিজ্ঞাসা করিব? (কিঞ্চিদ্ভাবিয়া) না, আমার কাছে তো ফর্দ আছে তাই দেখি না দেখি না কেন? (ফর্দ খুলিয়া) হাঁ, এই যে ১২৪২ সাল ৩রা মাঘ, বিমলাপুরের কমলন্যায়লেঙ্কারের কন্যাকে আমিই বে করিছি, হু, দেখেছ? লেখা পড়া রাখা ভাল, মনে করে কত রাখা যায়?"

কুলীনদের এই পাইকারী হারে বিয়ে করার ফলে স্বামীর কর্তব্য পালনের প্রশ্নই উঠতো না। সধবা হয়েও কুলীন কন্যারা বৈধব্যের যন্ত্রণাই ভোগ করতেন। এর ফলে বিবাহিতা কুলীন মেয়েদের অনেকেই ব্যভিচারে লিপ্ত হতেন এবং প্রচুর জারজ সন্তানের জন্ম হতো। বিবাহ-বণিকদের মতো কুলীনদের আচরণে এই আর এক সমাজ-সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন। বহুদিন আগে 'মহিলা'র বিয়ে হলেও, স্বামীকে তিনি একদিনের জন্যও কাছে পাননি। তাই তাঁর প্রশ্ন — 'সেও আমার নয়ন পথে কখন পতিত হল না, তাহাদ্বারা দুঃসহ যৌবন যাওনা হইতে নিস্তার পেলেম না, তবে সে কি পতি? তাকে পতি বলবো কেন? তাই মহিলা তার নিজের পথ বেছে নেয়— 'ভাবনা কি? কত লোক আছে।....এমন সুখের সময় কেন দুঃখে কাটাবো? তুই ও আমার মতে আয়, কেন যৌবন বিফল করিতেচিস্?"

মাধবীরও একই দশা। তার নিজের কথায় —

দুরন্ত বসন্তকাল এযে যুবতীর কাল

কাল পেয়ে কি কাল ঘটায়।

পতিত বিচ্ছেদ-বাণ কত আর সহে প্রাণ

বুঝি ত্রাণ নাহি ইথে পায়।।

তাই মাধবীও শেষ পর্যন্ত মহিলার মতানুবতিনী হয়। অর্থগৃধ্নু বিবাহ-বণিকরা সেদিন নিজেদের আচরণের মধ্যদিয়ে যেমন সমাজকে ব্যাভিচারী করে তুলছিল তেমনি বিয়ে করা বৌদের কাছ থেকে তাদের শ্রমে ঘর্মে অর্জিত সুতো কাটায় সামান্য অর্থটুকুও কোনোরকম দায়িত্ব পালন না করে শোষণ করে নিচ্ছিল। এই নাটকের চতুর্থ অঙ্কে বিবাহ-বণিকের আচরণের মধ্যদিয়ে সেই সামাজিক সত্যটিও স্পষ্টতা লাভ করেছে। এই অঙ্কে বিবাহ-বণিক ভাবছেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ-শ্বশুরালয়ে গিয়ে হয়তো কিছুই পাওয়া যাবে না। হঠাৎ তার মনে হল — 'ভাল, ব্রাহ্মণীর কাটনাকাটাও কি কিছু নেই? দেখে আসিনে কেন?

এবার পুত্র অধর্মরুচির প্রসঙ্গে আসা যাক্। পিতার উপযুক্ত পুত্র সে। সেদিনের কুলীন সমাজের আদর্শস্থানীয় প্রতিনিধি। ঘর-জামাই অধর্মরুচি ধর্মশীলের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছে, শ্বশুরবাড়ীতে তার বাস। ধর্মরুচি প্রশ্ন করেছে — '...কি ব্যবসায় করেনৎ' অধর্মরুচির উত্তর — 'আমার বিবাহ ব্যবসা, আর কি ব্যবসা?' পুনরায় ধর্মরুচির প্রশ্ন — 'বিবাহ ব্যবসায়ে কি দেহযাত্রা নির্বাহ হয়? অধর্মরুচির উত্তর — 'হাঁ, হয়ে থাকে। মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেন আমাদিগকে যে নিষ্কর তালুক দিয়া গেছেন, তার হাজাশুকো নাই — তাতেই আমরা সুখে আছি। আমরা রাজারও রেয়েত নই, সেধেরও ঘাতক নই, আপনি কি কুলীনচ্ছেলের বিষয় জানেন না?'

এই কথার প্রসঙ্গে ধর্মরুচি অধর্মরুচির বিয়ের সংখ্যা জানতে চাইলে উত্তরদেয় —"আমাদের কুলীনেচ্ছলে অনেক বে করে থাকে, কিন্তু আমি ধর্মভীত অধর্মরুচি মুকুয্যে, আমি অধিক করি নাই।' তবুও ধর্মরুচি সংখ্যাটা জানতে চাইলে উত্তর পায় — 'আমি সাড়ে আঠার গণ্ডা বৈ আর বে করি নাই, কতগুলো বে কল্যে কি হবে? আমাদ্দাদা মহাশয় চারিকুড়ি পোনেরটা বে করেছেন, এখন তিনি অন্তদন্ডহীন হয়েছেন, তবু পেলে ছাড়েন না।' নিজেকে ধর্মভীত বলে দাদা মহাশয়ের চেয়ে নিজের বিবাহ-সংখ্যার ন্যূনতা উচ্চারণ করতে গিয়ে চরিত্রটি মঞ্চে যেভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়, তাতে দর্শক-সাধারণ আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। এক কুলীন পুরুষ বহু নারীর পাণিগ্রহণ করে তাদের প্রতি স্বামীর কোনো কর্তব্যই পালন করতো না। এমন কি স্ত্রীর কাছে অদর্শনীয়ই হয়ে থাকতো। যুবতী স্ত্রীরা দীর্ঘ অথবা চিরকালের মতো বিরহ যাপনে বাধ্য হতো। এই ঘটনার একটা মর্মান্তিক দুঃখের দিক যেমন আছে। তেমনি এই-সব যুবতী নারীদের কারো কারো ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ঘটনাও অবান্তর নয়। এই নাটকে তেমন ঘটনার কথা অধর্মরুচি চরিত্রের মধ্যদিয়ে আমরা কিছুটা অনুমান করতে পারি। আবার কুলীনরা এ জাতীয় ব্যভিচারকে মোটেই অসাধারণ কিছু বলে মনে করতো না। এটা ছিল তাদের কাছে জল-ভাতের মতো।

অধর্মরুচি তার এক কন্যার জন্ম সংবাদ পেয়ে বিব্রত বোধ করছে। পিতার কাছে বলছে—'কি বলবো বাবা, লজ্জা হয়; সে দেশে প্রায় তিন বছর যাই নাই; তাই বলি মেয়েটা হল।' কিন্তু অধর্মরুচির

লোকচোক্ষে যিনি বাবা (বিবাহ-বণিক) তিনি তো এ ব্যাপারে অনেক বেশি অভিজ্ঞ। তাই পুত্রকে সান্তনা দিয়ে বলে — '(উচ্চহাস্য করিয়া) বাপু হে! তাতে ক্ষতি কি? আমি তোমার জননীকে বিবাহ করিয়া তথায় একবারও যাই নাই, একেবারে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তা বাপু! আমরা কুলীনের ছেলে, আমাদের ওরকম হয়ে থাকে, তাতে ক্ষতি কি?' অগত্যা অধর্মরুচিও হয়তো পিতার দেওয়া ব্যভিচার সংক্রান্ত এই ধারনার দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে উঠেছিল। অধর্মরুচির নিজের উক্তিতেই এ দীক্ষার আরো ব্যাপক সাধন অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হয়েছে। অবৈধ গর্ভ-সঞ্চার হলে বাস্তবে তার প্রতিকার কেমন করে করা হতো, সে সম্পর্কে অধর্মরুচি বলেছে — অবৈধ গর্ভ হলে আত্মীয়েরা এসে জামাইকে নিয়ে যেতো এবং জামাই দশ-বিশ-তিরিশ টাকার বিনিময়ে অবৈধ গর্ভ তার সম্ভূত বলে স্বীকার করে নিতেও দ্বিধাবোধ করতো না। সব মিলিয়ে কৌলীন্যপ্রথার যাবতীয় বিষময় পরিমাণ সেদিনের সমাজের বাস্তব ছিল, তার প্রায় সবটাই এই আদর্শ কুলীন চরিত্রটির চিত্রায়নে নাট্যকার ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই কৌলীন্যপ্রথার প্রতি যেহেতু নাট্যকারের সহমর্মিতা ছিল না, সে-কারণে অধর্মরুচি চরিত্রটি নাট্যকারের সহানুভূতি বঞ্চিত হয়ে অনেকটা তথ্যচিত্রের আকার ধারণ করেছে।

ঘটক চরিত্র হিসেবে এ নাটকে আমরা দু'ধরনের ঘটক পেয়েছি। বিবেকসম্পন্ন শুভাচার্য যেমন ছিলেন, তেমনি অনৃতাচার্যরাও ছিল। কিন্তু অন্যাচার্যের মতো ধূর্ত ঘটকদের কাছে সেদিনের রমরমিয়ে ওঠা বিবাহ-ব্যবসায়ে শুভাচার্যরা ঠাঁই পাননি। চরিত্র হিসেবে তাই শুভাচার্যরা দানাও বেঁধে উঠতে পারেনি। তবে এ নাটকের ঘটনাকাল মাত্র দুদিনের। এই স্বল্প কালপরিধীতে বহু চরিত্রের আমদানি ঘটেছে বলে কোনো চরিত্রই উপযুক্ত আয়তনে বিকাশ লাভ করেনি। তার মধ্যে পূর্বালোচিত চরিত্রগুলি সামান্য আলোচনার যোগ্য হয়ে উঠেছে। এখানে আমরা অনৃতাচার্যের যে সামান্য পরিচয় পেয়েছি, তার স্বার্থপরতা ও হীন প্রতারকের ভূমিকা চমৎকার ফুটেছে। অনৃতাচার্য নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে —'আমার গুণের কথা কতো কহিব—আমি সাবর্ণ গৃহে কত শত কৈবর্তকন্যা ঢালাইয়েছি; শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বরে ক্ষত্রিয় কন্যা, বিষ্ণুঠাকুরের বংশে বৈষ্ণব কন্যা, শিব চক্রবর্তীর সন্তানে পদ্মরাজ দুহিতা ঘটায়েছি, আর কানা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর, এ সমস্ত ত আমার শরীরের আভরণ।' এ ছাড়া অর্থের লোভে বিবাহের পক্ষে নিষিদ্ধ দিনেও বিবাহ ঘটাতে এরা পিছপা ছিল না। সপ্তশালকের মতো অশুভ দিনে — যেদিনে বিবাহ হলে স্ত্রী বিধবা হয়, সেদিনেও কুলপালকে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে অনৃতাচার্য আত্মপক্ষ সমর্থন করেছে।

এই নাটকে নাট্যকারের সহানুভূতির অভাবে বেশিরভাগ পুরুষ চরিত্র মোটেই সার্থকতা লাভ করেনি। কিন্তু নারীচরিত্রগুলি নাট্যকারের সহানুভূতিতে ধন্য হয়েছে। বিদ্যাসাগর শিষ্য রামনারায়ণ কৌলীন্য প্রথার মতো দুর্বিষহ সামাজিক প্রথায় আমাদের দেশের নারীর যে-ভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছিল তাতে নিজের সমস্ত সহানুভূতিকে (উজাড় করে) দিয়েছেন।

৩০১.১.১.৭ : আর্দশ প্রশ্নাবলী

১। বাঙালী সমাজে কৌলীন্যপ্রথার যে বিভীষিকা দেখা দিয়েছিল, তার ঐতিহাসিক সূত্রের সন্ধান দাও এবং কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকে সেই বিভীষিকার যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কৌলীন্য প্রথার যে বিকট রূপ দেখা যায় তার পরিচয়সহ 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের বিষয়বস্তুতে সেই সময়ের যে প্রতিফলন ঘটেছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৩। সামাজিকভাবে কৌলীন্যপ্রথাকে ঘিরে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রতিক্রিয়া এবং রামনারায়ণের নাট্যরচনার ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৪। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' প্রথম কৌলীন্য প্রথা বিরোধী বাংলা নাটক' — আলোচনা করো।

৫। উদ্দেশ্যমূলক নাটক হিসেবে 'কলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের মূল্যায়ন করো।

৬। 'কুলীনকুলসর্বস্বের কাহিনী বহুমাত্রিক সমাজ-সমস্যার চিত্রশালা' — আলোচনা করো।

————

একক - ২

নারী চরিত্র

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.১.২.১ : নারী চরিত্র

৩০১.১.২.২ : নারী : সমাজ-নিগড়ের বিপরীত অভিমুখে

৩০১.১.২.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০১.১.২.১ : নারী চরিত্র

কুলপালকের চার কন্যা **জাহ্নবী, শান্তবী, কামিনী** ও **কিশোরী**। এ নাটকের মূল কাহিনী এই চার কুলীন কন্যার বিবাহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এরা চার সহোদরা একই কৌলীন্যপ্রথার বিষময় পরিণামের বলি। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এই চারটি রূপায়নে নাট্যকার রামনারায়ণের শক্তিকে চমৎকার ভাবে লক্ষ করেছেন —"এই চারিটি সহোদরা, একই সুখ-দুঃখের অধীন, একই দুর্ভাগ্যের অধিকারিণী, একই অবস্থায় দাসী; কিন্তু রূপায়ণের ভিতর দিয়া নাট্যকার চারিটি চরিত্রকেই একাকার করিয়া ফেলেন নাই — ইহাই নাট্যকারের প্রধান কৃতিত্ব, এখানেই নাট্যকারের চরিত্রসৃষ্টির প্রতিভার পরিচয়।" আসলে নাট্যকার চার বোনের মধ্যে বয়সের যে ব্যবধান, সেই ব্যবধান অনুসারে বিয়ে ব্যাপারটির প্রতি তাদের পৃথক-পৃথক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে নাটকে চরিত্র হিসেবে তাদের স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। আকস্মিকভাবে ঠিক হওয়া বিয়ের কথা বিয়ের দিন সকালে জননী তাদের জানালে, চারজনের মধ্যে চার রকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। বড় বোন জাহ্নবীর বয়স ৩২। পরের তিনজনের বয়স যথাক্রমে ২৬,১৬, ও ৮ বছর। তাই বিয়ের ব্যাপারে প্রত্যেকের প্রতিক্রিয়া অপরের থেকে ভিন্ন। জাহ্নবীর প্রতিক্রিয়া সেদিনের অতিক্রান্ত যৌবনা কুলীন কন্যাদের মতো। এই বয়সে বিয়ে একটা অর্থহীন ব্যাপার। জাহ্নবীর কাছেও তাই। যে আশা ও স্বপ্ন নিয়ে একটি মেয়ে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে, জাহ্নবীর আর সেই বয়স নেই। সে সহজেই বিয়ের ব্যাপারটাকে বিদ্রুপ করে বলতে পেরেছে —'কেন আর বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ।' তার মনে হতে থাকে মৃত্যুর মুখে পৌঁছে যমরাজের সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে। কিন্তু তবুও অনূঢ়া নাম ঘোচানোর জন্য কুলীন কুমারীরা উৎসুক হয়ে থাকতো। জাহ্নবীর ক্ষেত্রেও তাই — মনের ভেতরে ভেতরে যে একটা সান্তনা লাভও করে, হয়তো খানিকটা আনন্দও।

জাহ্নবীর পরের বোন **শান্তবী**। জাহ্নবী অপেক্ষা সে ছয় বছরের ছোট। এই বয়সের ব্যবধানে শান্তবীর মনের কি প্রকারান্তর ঘটা সম্ভব তা রামনারায়ণ যথার্থ ভাবেই অনুধাবন করেছেন। মধ্যযৌবনে উপনীত

শাম্ভবীর চোখে তখনো ভোগের স্বপ্ন লেগে আছে। কিন্তু এতবড় সুখবরটায় তার বিশ্বাস হয়না। মাকে সাবধান করে দিয়ে সে বলে —

"বল্লাল বলে, কুলীন বামনের মেয়ের কপালে বেনাই। তা দেখিস্, সাবধান, সাবধান। ব্রাহ্মনী। বাছা, এখন কি বল্লাল আছে! সে যে অনেক দিন মরেচে। শাম্ভবী। সে বলে কি হবে মা! তাচ্চেয়ে তার চেলা বড়, তারা মেলা বেড়াচ্চে' দেখিস।" কিন্তু তারপরেও যখন সে শুনলো, পিতা তাকে কুলরক্ষা করেই বিয়ে দিচ্ছে, তখন সে নির্লজ্জের মতো জননীকে জিজ্ঞাসা করেছে — "ও মা, তুই কি কুলরক্ষা কর্ব্যি, তবে জাতি রক্ষা কে কর্ব্যে মা।' জাহ্নবী যে আশঙ্কার কথা আর মনে স্থান দেয়নি, শাম্ভবীর মনে এখনো সেই অশঙ্কার কথা জেগে আছে। কুল রক্ষিত না হলেও কুলের বেড়া ভেঙে একদিন সে জাতরক্ষা করবে। জননী এ কথার উত্তর দিতে পারে না — কন্যার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নীরব হয়ে যায়। শাম্ভবী তার দিদিকে দেখে কোনোদিন মনে করতে পারেনি যে, তার বিয়ে হবে বা তার দিদি জাহ্নবীর বিয়ে হবে। কিন্তু রক্ত-মাংসের লালসা তার দেহে-মনে জেগেই আছে। সেই জন্যই কুলরক্ষা অপেক্ষা জাতিরক্ষার কথা তার মনে হয়। বিবাহ একেবারে না হউক, তা তার কাম্য নয়। তাই যখন হচ্ছে, তখন "আচ্ছা হউক, দেখা যাউক; এ কথাই সে বলে। এর বেশী তার আর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

নতুন যৌবনপ্রাপ্ত কুলপালকের তৃতীয় কন্যা কামিনী বিয়ের কথায় চঞ্চল ও উচ্ছসিত হয়ে ওঠে। বলে- "শুনিয়া এ' শুভকথা হয়েছি চঞ্চল।" ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য কামিনীর এ সময়ের মানসিক অবস্থাকে চমৎকার ভাবে বিশ্লেষণ করে বলেছেন — 'যে বয়সে মুখের কথা হয় কাব্য, পথ চলা হয় নৃত্য, কামিনীর এখন সেই বয়স। সংসারের কোনো আঘাতই তাহার গায়ে লাগে না, সেই জন্য আপনা হইতেই তাহার মুখ দিয়া কবিতা বাহির হইয়া আসিল। দেহের মধ্যে তাহার সদ্য যৌবনের বিকাশ হইলেও, অন্তরে সে এখনও শিশু। তাই বর সম্পর্কে তার বিচিত্র কৌতুহল। বরের বয়স কতো, কোথায় বাড়ি, দেখতে কেমন ইত্যাদি খবর সে নানাভাবে সংগ্রহ করে। কিন্তু তারও মনে হয়, পাছে এ বিয়ের প্রস্তাবও পূর্ববর্তী প্রস্তাবগুলির মতো মিথ্যা আশ্বাসে পরিণত হয়। কামিনী। না মা, তোর কথায় আর বিশ্বাস নেই, তুই এমন করে আমায় কতবার ভুলিয়েছিস।

ওমা আর ভুলাইলে কি হবে তা বল।

কাপড় ঢাকাতে কোথা থাকে গো অনল..

সহিতে না পারি আর কর গো উপায়।

কতকাল ভুলাইয়া রাখিবি আমায়।।

ব্রাহ্মণী : না মা, এবার মিছা নয়, সত্যি গো সত্যি।

কামিনী। ও মা? সত্যি যদি তবে বর কি এসেছে? বাসা দিছিস কোথায়

মা? চুপি চুপি দেখতে গেলে হয় না, ক্ষতি কি মা?

শেষপর্যন্ত কনিষ্ঠা কিশোরীকে সঙ্গে নিয়ে সে বর দেখতে গেল। বরের সম্পর্কে যে স্বপ্ন তার মনে জেগে উঠেছিল, রূঢ় বাস্তবের আঘাতে তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। বরের মূর্ত্তি দেখে সে বারবার শিহরিত

হয়ে উঠতে লাগল। তার কোমল হৃদয়ের উপর বাস্তবের এই রূঢ় আঘাতে দর্শকেরাও বুঝি শিহারিত হল। লেখক ও পাঠকের সমবেত সহানুভূতিতে সুন্দ্র চরিত্রসৃষ্টির নজির হয়ে রইল কামিনী।

কুলপালকের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা কিশোরী। বয়স তার আট বছর। এই কন্যাটির চরিত্র অপর তিন বোনের তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জ্যেষ্ঠ জাহ্নবী বিবাহিত জীবন সম্পর্কে বিগতস্পৃহ, শান্তবীর চোখে বিবাহ 'আশা মরীচিকার জাল' বিস্তারকারী, কামিনীর বিবাহ সম্পর্কে কোনো পূর্ব-সংস্কার নাই, আছে অদম্য কৌতুহল। কিন্তু কিশোরী বিবাহ সম্পর্কে সেই সামান্য কৌতুহলটুকুও বর্জিত। সকালে ঘুম থেকে উঠে সে পাড়ার সঙ্গিনীদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা খেলে বেড়াতো। বিয়ের খবর জানতে মা ও বোনেরা যখন ডাকাডাকি শুরু করলো, তখন সে মার কাছে শুনলো— 'আজ আমাদের বাড়ীতে এক শুভকম্ম হবে।' কিশোরী কিছুই জানেনা। তাই শুভকম্মটি কি সে জানতে চাইল। ব্রাহ্মণী জানালো — 'আজি তোদের 'বে' হবে।' ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজে বাল্যবিবাহ ছিল আর এক ব্যাধি। রামনারায়ণ এই চরিত্রটির মধ্যদিয়ে সেই সামাজিক ব্যাধিটিকেও নাট্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এক সরল শিশুকন্যার ওপর সামাজিক প্রথার যে নিষ্ঠুর নির্মম নিয়তির নাটকীয় বৈপরীত্য সৃজন রামনারাণের অসাধারণ শক্তিসত্তার পরিচয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিশোরী মাকে জিজ্ঞাসা করেছে 'বে' কারে বলে মা।' এই নাটক রচনার বহুকাল পরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে কপালকুন্ডলার মুখে এমনই এক প্রশ্ন ' বি-বা-হ' উচ্চারণ করিয়ে ছিলেন। কিন্তু এ নাটকে কিশোরীর প্রশ্নের উত্তরে মা তাকে বুঝিয়ে বলেছে, 'বে কাকে বলে জানিসনে বাছা! প্রধান সংস্কার।' এ উত্তরে কি কিশোরীর কিছু বোঝার উপায় ছিল। বিবাহ ব্যাপারটাযে নিজের থেকে না বোঝে তাকে কি এমন ভাবে কিছু বোঝানো যায়? কিশোরীও কিছুই বুঝলো না। বুঝলে না বলেই আবার প্রশ্ন করলো—'ও মা! তাকি আমি খাব।' কিশোরী তার শিশু প্রকৃতিতে বিয়েকে খাদ্যবস্তু ভেবেছে যথার্থভাবেই। মা আবার তাকে বুঝিয়ে বলেছে বিবাহ খাদ্যবস্তু নয়। আজ তার বড়দি, মেজদি ও ছোড়দিরও বিয়ে হবে একই সঙ্গে। কিশোরীর আবার প্রশ্ন — 'ওমা! তবে তোর হবে না? পরিবারের সব মেয়ের যদি বিয়ে হয়, তবে তার মারও বিয়ে একসঙ্গে কেন হবে না তা কিশোরীর কাছে বোধ্য নয়। কৌলীন্যের নামে এই যে সরলপ্রাণ শিশুকন্যাটির বলিদানকে এমন দৃশ্যগ্রাহ্য করে তোলার মধ্যদিয়েই রামনারায়ণ তাঁর নাট্যশক্তির পরিচয় ইতিহাসে অক্ষয় করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। এক কানা খোঁড়া ষাট বছরের বৃদ্ধের সঙ্গে এই শিশুকন্যার বিবাহ-বন্ধনের সমাজ প্রচলতা, অত্যন্ত হৃদয়হীন ব্যক্তির পক্ষেও কল্পনা করা অসম্ভব। অথচ এই-ই ছিল সেদিনের বাস্তবতা। রামনারায়ণের শিল্পী হিসেবে সমস্ত সহানুভূতিই সেদিন কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল এই হতভাগ্য কন্যা-চরিত্রগুলির ওপর।

ফুলকুমারী চরিত্র রামনারায়ণের আর একটি শক্তিশালী সৃষ্টি। কৌলীন্যপ্রথার বহুমাত্রিক বিষক্রিয়াকে দেখানোর যে উদ্দেশ্য নিয়ে নাট্যকার এ নাটকটি সৃষ্টি করেছিলেন, এ চরিত্রটি তার অন্যতম ফসল। কুলীন কন্যার বিবাহ হওয়া নিয়ে যে সমস্যা সমাজে ছিল, সে-সমস্যা কুলপালকের চারকন্যার কাহিনীর মধ্য দিয়ে আমরা লক্ষ করেছি। কিন্তু বিবাহিত কন্যার জীবনও যে কৌলীন্য প্রথার নিষ্ঠুরতায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল, তা এই ফুলকুমারী চরিত্রটির মধ্যদিয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। ফুলকুমারী চরিত্রটি আঁকতে গিয়ে নাট্যকার কেবল কৌতুক ও কৌতূহল দিয়েই তাকে আঁকেননি, তার বঞ্চিত জীবনের হাহাকারকে তিনি উপলব্ধি করেছেন ও দর্শকদের উপলব্ধি করাতে পেরেছেন, তাতেই তাঁর সার্থকতা।

স্বামীসঙ্গ বঞ্চিত ফুলকুমারীর জীবনে একদিন এলো, যে-দিন স্বামী তার কাছে এসে উপস্থিত হল। খবর শুনে ফুলকুমারী নিজেকে ব্যক্ত করেছে — "সে কথা শুনিয়া ভাসি সুখের সাগরে, পথ না দেখিতে পাই আনন্দের ভরে।" ফুলকুমারীর বয়সের পক্ষে দীর্ঘদিন স্বামীসঙ্গ বঞ্চিতা নারীর এমন আনন্দে উচ্ছ্বাসে ভরে ওঠাটাই স্বাভাবিক। বঞ্চনার কথা ভুলে এই মুহূর্তে কুলীনকন্যা ক্ষণিকের অতিথি স্বামীকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হল। আসন্ন রাতটিকে ঘিরে তার কতো সাধ, কতো স্বপ্ন-কল্পনা। অন্যদিকে —

শশব্যস্ত হল সবে জামাই দেখিয়া।
বাহিরে বসিতে দিল গালিচা পাতিয়া।।
ধনুর্ভঙ্গ পণে কহে সবা বিদ্যমানে!
ব্যাভার পাইলে তবে পা ধোব এখানে।।
শুনিয়া জননী মোর বড়ই দুঃখিনী।
খাড়ু বাঁধা দিয়া কিছু আনিল আপনি।।

জামাই পা ধুলেন বটে, কিন্তু ব্যাভার মনের মতো হল না। তাই 'ইহা খায় উহা ফেলে নবাবি করিয়া'। রাতে শোয়ার ঘরে গিয়ে জামাই স্ত্রীকে বলে —

শীঘ্র করি অর্থ মোর হাতে দেও আনি।
নতুবা অনর্থ হবে বুঝ অনুমানি।।

ফুলকুমারী কাট্না কাটা কড়ি থেকে শুরু করে, নিজের সঞ্চিত যা-কিছু ছিল, সবই স্বামীকে দিল। কিন্তু এই অল্প অর্থে-স্বামী সন্তুষ্ট হল না। সে শ্বশুরের টোলে গিয়ে, দরমা পেতে রাত্রিযাপন করে সকালে চলে গেল। কান্নায় ফেটে পড়ল ফুলকুমারী —

মম সম অভাগিনী আছে কোনো্ দেশে।
হাতে দিয়ে নিধি বিধি হরে নিল শেষে।।

কুলপালকের গৃহে চার কন্যার যখন বিয়ের আয়োজন চলছে, তখন এই ফুলকুমারী চরিত্রের অবতারণা করে নাট্যকার অবিবাহিত কুলীন কন্যাদের সমস্যার সঙ্গেই বিবাহোত্তর কুলীন নারীর সমস্যাকে যুক্ত করে সমাজে কৌলীন্যপ্রথার সমস্যাকে তার বহুব্যাপ্ত চেহারায় আমাদের কাছে ধরে দিয়েছেন। উত্তরকালের বাংলা সাহিত্যে এই চরিত্রটির প্রভাব সম্পর্কে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় মন্তব্য করেছিলেন—"ফুলকুমারীর চরিত্রটিই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের শ্যামা-চরিত্রের ভিত্তি।"

একটি **জননী** ও একটি **শিশুচরিত্র** এই নাটকে আছে যা সমালোচকের কথায় 'বিশেষভাবে লক্ষ করিবার যোগ্য।' এ দুটিতে কৌতুকধর্মিতা, মতপ্রচারের উদ্দেশ্য বা প্রহসন রচনার কোনো লক্ষণই নেই। জননী ও শিশুর চিরন্তন বাৎসল্যই এখানে ফুটে উঠেছে। শিশুটির পিতা একান্তই আত্মপরায়ণ, দক্ষিণালোভী উদরপরায়ণ। এর বিপরীতে জননী সুমতির চরিত্রটি হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল। কুলপালকের মেয়েদের বিয়েতে উদরপরায়ণের নিমন্ত্রণ হয়েছে শুনে শিশুটি পিতার সঙ্গে নিমন্ত্রণ খেতে যাওয়ার বায়না ধরেছে। জননী

সুমতি স্বামীর কাছে অনুরোধ করছে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু উদরপরায়ণ একান্ত আত্মসুখপরায়ণ। শিশু পুত্রের জন্য তার কোনো কর্তব্যবোধ কাজ করে না। তাই সে পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায় না। বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও সে আপত্তি জানিয়েছে পুত্রকে নিয়ে যেতে। তখন তার স্ত্রী সুমতি শেষ অস্ত্রটি প্রয়োগ করে শিশুকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছে — 'ভাল মন্দ সামগ্রী খেতে পায় না, নে যাও, খেয়ে আসবে।' কিন্তু এতেও উদরপরায়ণের মন টলেনি। শিশুটিকে চপেটাঘাত করে সে চলে গেছে ফলার খেতে। এখানে শিশু চরিত্রটি যেমন সজীব, জননী চরিত্রটিও তাই। হয়তো অপরিসর অসম্পূর্ণ এই চরিত্র দুটি। কিন্তু শিশু চরিত্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের আগে রামনারায়ণেই তার সূচনা বলে একটি অতিরিক্ত গুরুত্ব এই দুই চরিত্র চিত্রণে নাট্যকারের প্রাপ্য।

কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকের সমস্যা যে কোনো ব্যক্তিবিশেষের সমস্যা নয়, সমগ্র সমাজের সমস্যা, নাট্যকার সেই বোধকে ফুটিয়ে তুলতে অপরিসরে হলেও বহু চরিত্রের আমদানি করেছেন। এরকম একটি চরিত্র **যশোদা**। কুলপালকের চার কন্যাকে এক ষাট বছরের কানা খোঁড়া বরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা ছিল আরও কঠিন। এরচেয়ে অতিবৃদ্ধ বরে, এবং আরও অধিক সংখ্যক মেয়েকেও তখন একই সঙ্গে সম্প্রদান করা হতো। যশোদা এবং তার অন্য দুবোনকে যে বরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার বয়সের সমান পাহাড় পর্বতও কম। যশোদা বলেছে —

ভগিনী আমার ছয় আমারে নে সাত হয়
সবার বিবাহ একদিনে।....
পাইয়া সুযোগ্য ঘর বলি মোরা সেই বর
অতঃপর সে পায় পঞ্চত্ব।
তখনি বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হই সপ্তস্বসা
কিবা কব কুলের মহত্ত্ব।।

সুলোচনা চরিত্রটির মধ্যদিয়ে কুলপালকের কনিষ্ঠা কন্যা কিশোরীর বিবাহ নিয়ে যে সমস্যাটিকে তুলে ধরা হয়েছে, তার বিপরীত আর এক সমস্যাকে তুলে ধরেছেন রামনারায়ণ। সুলোচনা কুলপালকের মেয়েদের বুড়ো বরের কথা শুনে আশ্চর্য বোধ করেনি। সে বলেছে, 'বুড়ো বর? এতো ভাল, মন্দ কি?' কিন্তু পরক্ষণেই বোঝা যায় সুলোচনা কেন এমন বুড়ো বরকেও ভাল বলছে —

কি জানিবে ওলো ধনি এ বর মাথায় মণি
মোর পতি দেখে বুক ফাটে,
বয়স খাতালে পর নাতি ভেবে এ সে জ্বর
কোল শোভা হয়ে রাত কাটে।

কিন্তু চিরবিরহিনী চন্দ্রমুখীর মনে হয়, স্বামী কোনোদিন না আসার চেয়ে, নাতির বয়সী স্বামী থাকাও ভালো, কেন না সে তো বড়ো হয়ে একদিন স্বামীর দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে।

৩০১.১.২.২ : নারী : সমাজ নিগড়ের বিপরীত অভিমুখে

সমাজ সেদিন নানা কঠিন নিগড়ে নারীর জীবনকে বন্দী করতে চাইলেও জীবনের ধর্ম সে নিগড়কে ছিন্ন করে নিজের গতিতে এগিয়ে চলার চেষ্টা করবে — তাকে থামিয়ে রাখা ছিল অসম্ভব। সমাজের বাস্তবেও তাই ঘটেছে। **যশোদার** সাত বোনের এক দিনে বিধবা হওয়া কথা আমরা আগেই বলেছি। এই বিধবাদের কোনো শুভানুষ্ঠানে যোগ দেওয়া বারণ ছিল। সে-কারণে মর্মান্তিক যন্ত্রণা নিয়ে তাদের দিন কাটতো। কিন্তু **রসিকার** মতো বিধবারা বেছে নিত অন্য পথ —

নবীন যুবতী আমি মরেছে আমার স্বামী
তবু কভু দুঃখ নাহি জানি।....
তৃষিত পথিকগণ এসে করে আকিঞ্চন
যদি পায় মোর ঘরে বাসা।
নাহি যায় অন্যস্থান করে সবে অবস্থান
এমন আমার ভালবাসা।

কুলপালকের মেয়েদের বিয়ের দিনে, সখিদের কাছে নিজের দুঃসহ বেদনার বর্ণনা দিতে গিয়ে **যমুনা** বলেছে —

বাপের প্রদান ঘর নাহি মিলে যোগ্যবর
কুলের বড়ই আঁটাআঁটি।
মনে সদা এই চাই বাহির হইয়া যাই
পড়ে কুলে কালি পরিপাটি।।
আইবুড়ো থেকে মোর বয়স হইল ভোর
নুড়ো দিই মুখে বল্লালের।।

হেমলতাও বলেছে —

যৌবন দুঃসহ ভার সহিতে না পারি আর
শরীরে কত জ্বালা সয়।
বয়স্ হইল বিশ ইচ্ছা হয় খাই বিষ
মনে মনে কত রীষ হয়।।...
মনেতে ভেবেছি সার সুধিব বল্লালি ধার
কুলে জলাঞ্জলি দিয়া পরে।।

সমাজের নিয়ম-নিগড়কে ছিন্নকরার আরও দু-একটি নারী চরিত্র এ নাটকে রামনারায়ণ অঙ্কন করেছেন। যেমন বহুদিন পূর্বে **মহিলা** নামের এক নারীর বিবাহ হয়ে থাকলেও, স্বামীকে তিনি একদিনের

জন্যও কাছে পাননি। তাই তাঁর প্রশ্ন — 'সেত আমার নয়ন পথে কখন পতিত হল না, তাহা দ্বারা দুঃসহ যৌবন যাতনা হইতেও নিস্তার পেলেম না, তবে সে কি পতি?' শেষপর্যন্ত মহিলা তার নিজের পথ নিজে বেছে নেয় —'ভাবনা করি? কত লোক আছে.....এমন সুখের সময় কেন দুঃখে কাটাবো?' **মাধবীরও** একই দশা—

দুরন্ত বসন্ত কাল এ যে যুবতীর কাল
কাল পেয়ে কি কাল ঘটায়।
পতির বিচ্ছেদ-বাণ কত আর সহে প্রাণ
বুলি ত্রাণ নাহি ইথে পায়।

অবশেষে মহিলার পথেই মাধবীর ত্রাণ ঘটে। কিন্তু এসব চরিত্রকে ঠিক চরিত্রের পূর্ণ আয়তনে আমরা পাইনা। এরা সবাই মিলে যেন এক বহু বর্ণময় চরিত্রের রামধনু।

৩০১.১.২.৩ : আর্দশ প্রশ্নাবলী

১। 'কুলীনকুলসর্বস্বে'র পুরুষ চরিত্রগুলি লেখকের সহানুভূতি বঞ্চিত হয়ে সৃষ্টি হিসেবে ব্যর্থ হয়েছে—আলোচনা করো।

২। 'কুলীনকুলসর্বস্বে'র নারী চরিত্রগুলির তুলনামূলক সার্থকতার কারণ নির্দেশ করে কয়েকটি নারী চরিত্রের পরিচয় দাও।

৩। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে এমন কয়েকজন নারীর পরিচয় পাওয়া যায়, সেদিনের সমাজ-নিগড়ের বিপরীত অভিমুখে যাত্রা করেছিল। এদের পরিচয় দাও।

৪। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে চরিত্রদের নামকরণে কোনো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে কি? এই সব নামকরণ নাটকটির পক্ষে কতখানি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে তা বুঝিয়ে দাও।

৫। কুলপালক পিতাদের দুরবস্থার বর্ণনা দিয়ে সামাজিক নাটক রূপে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' কতটা সার্থক—তা বিচার করো।

৬। নারী চরিত্রগুলি উপস্থাপনায় রামনারায়ণ তর্করত্ন যে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা তাঁর 'কুলীন কুলসবস্ব'—নাটকের প্রেক্ষিতে আলোচনা করো।

———

একক - ৩

কুলীনকুলসর্বস্বে সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভাব

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.১.৩.১ : কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক-না-প্রহসন

৩০১.১.৩.২ : কুলীনকুলসর্বস্বে সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভাব

৩০১.১.৩.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০১.১.৩.১ : কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক না প্রহসন

নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন নিজের রচনার নাম দিয়েছিলেন 'কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক'। কিন্তু সমসাময়িক কালের পত্রিকা — হিন্দু প্রেট্রিয়ট (১৯ই মার্চ, ১৮৭৫ খ্রিঃ) কুলীনকুলসর্বস্বকে প্রহসন বলেই উল্লেখ করেছে — ''Friday, The 13th March....The EDUCATIONAL GAZETTE States that the Well-Known farce of koalino Kooloshorbushya was acled in the private residence of a Baboo in Calcutta with great success.'' পরে আমরা দেখেছি, ড. সুশীলকুমার দেও 'কুলীনকুলসর্বস্ব'কে (১৮৫৪) সমসাময়িক বাঙলার সমাজজীবনের বাস্তবতা নিয়ে রচিত প্রথম প্রহসন বলে মনে করেছেন। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়' (পৃ.২৬) ড. দে লিখেছেন, "এই নাটকটি.....তৎকালীন সমাজ বিশেষের চিত্র স্বরূপ.....বাঙ্গালা ভাষায় সামাজিক বিষয় লইয়া এই প্রথম নাটক রচনার চেষ্টা, ইহা ঠিক নাটক না হইলেও সামাজিক রঙ্গচিত্র হিসাবে সুন্দর হইয়াছে।" ফলে নাট্যকার 'নাটক' হিসেবে 'কুলীনকুলসর্বস্ব'কে চিহ্নিত করলেও, সেই সাময়িক পত্রের যুগ থেকে শুরু করে একালের কোনো কোনো সমালোচক পর্যন্ত তার নাটকীয়তাকে স্বীকার করেননি। ফলে, আমাদের সামনে প্রশ্নটি গুরুত্বের সঙ্গে এসে দাঁড়ায়।

প্রহসনের মুখ্য উদ্দেশ্য দর্শকদের জন্য সরল অনাবিল ও আন্তরিক হাস্যকৌতুক পরিবেশন করা। এরকম হাস্যকৌতুকময় দৃশ্য আমরা মধ্যযুগে ইংরেজী miracle play মধ্যে দেখেছি, শেক্সপীয়রের The Taming of the shrew, The comedy of Errors. সোমারসেট মম-এর Home and Beauty কিংবা বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'কল্কি অবতার', জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ জলযোগ ও অলীকবাবু এবং রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ও শেষরক্ষায় পাই। এই ধরনের রচনা ইংরেজীতে Farce, ইতালীয়তে Farse, ল্যাটিনে Farcita নামে পরিচিত। ইংরেজী ভাষায় ব্যবহৃত শব্দটির সমার্থক পরিভাষা হিসেবে বাংলা ভাষায় আমরা প্রহসন শব্দটি ব্যবহার করি। 'অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্য তত্ত্ব' গ্রন্থে সাধনকুমার ভট্টাচার্য জীবনের অতিলঘুরূপ বা comic aspect of life -এর পর্যালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'জীবনের রূপকে মোটামুটিভাবে....তিনটি বৃত্তের দ্বারা সীমায়িত করে দেখা যেতে পারে। প্রথম

বৃত্তে — জীবনের ট্র্যাজেডির রূপ, দ্বিতীয় বৃত্তে জীবনের ট্র্যাজিক— কমেডি-এর সিরিয়াস কমেডি রূপ; তৃতীয় বৃত্তে — জীবনের কমিক বা হাস্যোদ্দীপক রূপ। "ফার্স বা প্রহসন হচ্ছে জীবনের এই তৃতীয় বৃত্তেরই নাট্যরূপায়ন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে — ''a form of comedy in dramatic art, the object of which is to excite laughter by ridiculous situations and incidents.'' A. Nicall তাঁর Dramatic Theory -তে এর পরিচয় দিয়েছেন— This situation....is of the most exaggerated and impassible kind, depending upon the coarsest and rudest of imprabable incongruities.''

প্রহসন নাট্যশিল্পের কমেডির পর্যায়ভুক্ত। সার্থক কমেডি বা শ্রেষ্ঠ নাট্যশিল্পের জগতে এর প্রবেশাধিকার নেই। ট্র্যাজেডি বা কমেডিতে মানুষ্যজীবনের যে গভীরতর সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়, প্রহসনে তা প্রত্যাশিত নয়। অবশ্য জীবনসত্যের রূপায়ন ক্ষমতা ট্র্যাজেডিতে ও কমেডিতে সমান নয়। কমেডি ট্র্যাজেডির তুলনায় নিম্নস্তরের রচনা। অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডি সম্পর্কে বলেছেন — ''is an imitation of action that is serious, complete and of certain magnilude.'' কমেডি সম্পর্কে তিনি বলেছেন ''an imitation of characters of a lower type.'' যা স্থূল, অসঙ্গত ও পারমার্থ বঞ্চিত, প্রহসনের কারবার তাকেই নিয়ে। এসব নিয়ে একটি হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দর্শকদের আনন্দ দেওয়াই প্রহসনের উদ্দেশ্য। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে এই আনন্দদানের উদ্দেশ্যের পেছনে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যও থাকে। সে উদ্দেশ্য সমাজ বা ব্যক্তি জীবনের কোনো অন্যায়-অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গ করার লক্ষ্যে। তবে প্রহসনে ব্যঙ্গ যতই তীব্র হোক না কেন, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একটা লঘু ও কৌতুকময় আবহ। সাধারণত প্রহসনের পরিসর খুব ছোট হয়। এই সংক্ষিপ্ততাই ট্র্যাজেডি বা কমেডির আঙ্গিকের দিক থেকে প্রহসনকে পৃথক করে। সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে প্রহসন সমাজের কোনো অন্যায় ও অসঙ্গতির উপরে লঘু বিদ্রূপ বর্ষণ করে। এই কারণেই প্রহসনের মধ্যে সূক্ষ্ম চরিত্র সৃষ্টির সুযোগ পাওয়া যায় না। এর প্লটের মধ্যেও জটিলতা বা বিস্তৃতি থাকে না। এজন্যই প্রহসন উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের স্তরে পৌঁছোতে পারে না।

প্রহসনের এই সব বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণে রেখে আমরা যখন 'কুলীনকুলসর্বস্ব'- কে বিচার করতে যাই, তখন প্রহসনের বহু লক্ষণই এর মধ্যে দেখতে পাই। কুলীনকুলসর্বস্বের বিষয়বস্তু হল কৌলীন্য প্রথার দোষ ও অসঙ্গতিকে হাস্যরসাত্মক দৃশ্যাবলীর মধ্যদিয়ে দেখিয়ে এর নিন্দা করা হয়েছে। লেখক বিজ্ঞাপনে বলেছেন — "পুরাকালে বল্লাল ভূপাল, আবহমান প্রচলিত জাতি মর্যাদা মধ্যে স্বকপোলকল্পিত কুলমর্যাদা প্রচার করিয়া যান, তৎপ্রথায় অধুনা বঙ্গস্থলী যেরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনো প্রস্তাব লিখিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী ছিলাম.....।" অতএব কৌলীন্য প্রথাকে বিদ্রূপ করার লক্ষ নিয়ে যে এটি রচিত তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। এরকম সামাজিক বিষয় প্রহসনের বিষয়বস্তুরই উপযোগী। এ নাটকে মাত্র দুদিনের ঘটনায় বহু চরিত্র আমদানি করা হয়েছে। তাই এর পরিসরগত সংক্ষিপ্ততাও প্রহসনের মতোই। এই স্বল্প পরিসরে প্রত্যেকটি চরিত্রের ক্রিয়া পরিপূর্ণ আয়তেন বিকাশের সুযোগ পায়নি— যথোপযুক্ত জটিলতাও তাদের নেই। কাহিনী গ্রন্থনায়ও কোনো জটিলতা নাই — যেমনটি হয়ে থাকে প্রহসনে। 'কুলনীকুলসর্বস্ব' নাটকের মূল কাহিনী কুলপালকের পরিবারকে কেন্দ্র করে। এই পরিবারের চরিত্রগুলি বিচিত্র ঘটনা ও ক্রিয়ার মধ্যদিকে বিকশিত হয়ে ওঠেনি। এরা কেউই জীবনে বিচারভ্রান্তির জন্য কিংবা স্বকীয় কোনো চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে দুঃখ ভোগ করেনি বলে জীবনের কোনো গূঢ় তাৎপর্যকে এরা প্রকাশ করতে পারেনি। এদের জীবনের যে দুঃখ-কষ্ট তা সমস্তটাই প্রতিবিধানহীন এক সামাজিক বিধানের কারণে ঘটেছে। এই পরিবারের বাইরের যেসব চরিত্র নাট্যকার চিত্রিত করেছেন, তারাও সবাই টাইপ চরিত্র। তারা সমাজের

এক-একটা শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে টাইপ চরিত্রে পরিণত হয়েছে। আবার চরিত্রগুলির রূপায়ণে নাট্যকারের কৌতুক ও ব্যঙ্গও প্রকাশিত হয়েছে। সুস্থ ও স্বাভাবিক মূল্যবোধের চরিত্র প্রায় নেই বল্লেই চলে। দু' একজন যাওবা আছে, যেমন— শুভাচার্য, গ্রহাচার্য — এরাও সজীব চরিত্র হয়ে উঠতে পারেনি।

প্রহসনের লক্ষণের সঙ্গে 'কুলীনকুলসর্বস্বে'র এই সব বৈশিষ্ট্য যেমন মিলে যায়, তেমনি এ নাটকটি সর্বার্থে লঘু-রসাত্মকও হয়ে ওঠেনি। এইখানেই 'কুলীনকুলসর্বস্বের' বৈশিষ্ট্য নাটক-না-প্রহসন' — এ নিয়ে বিচার বিভ্রাটের কারণ দেখাদিয়েছে।

আগেই আলোচিত হয়েছে, এ নাটকের নারী চরিত্রগুলি সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপিত হয়েও লেখকের সহানুভূতিকে ধন্য করেছে, তারা পুরুষ চরিত্রগুলির মতো বহিরঙ্গ ক্রিয়ার মধ্যদিয়ে পরিস্ফুট টাইপ চরিত্র হয়ে ওঠেনি। তারা সামাজিক অন্যায় ও অবিচারে জর্জরিত হয়েছে, অতৃপ্ত হৃদয় কামনায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তারাও হয়তো কখনো রঙ্গরসিকতায়, কখনো খেদে ও বিলাপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবুও তারা প্রহসনের চরিত্রের মতো হাস্যকৌতুক সর্বস্ব নয়। বাংলা নাটকের ঐতিহাসিক ড. অজিতকুমার ঘোষ যথার্থই বলেছেন — "তাহারা হাস্যকৌতুকের রঙীন ফেনা তুলিয়া মুহূর্তের মধ্যে শেষ হইয়া যায় না, তাহারা আমাদের চিত্ততলে ভাবনা ও বেদনার গভীর স্থায়ী স্থানলাভ করে।" এ লক্ষণ প্রহসনের লক্ষণ নয় — উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যসৃষ্টির লক্ষণযুক্ত।

ড. অজিতকুমার ঘোষ এই প্রশ্নটির মীমাংসা করে লিখেছেন — কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক না প্রহসন? নিশ্চয়ই প্রহসন নহে। নাট্যকার ইহাকে নাটক বলিয়াছেন, শুধু তাহাই নহে, অন্তঃপ্রকৃতি এবং রসের স্থায়ী আবেদনের দিক দিয়া বিচার করিয়া ইহাকে গম্ভীর ও করুণ রসাশ্রয়ী নাটকই বলিতে হয়। এ কথা সত্য অনৃতাচার্য, অধর্মরুচি, বিবাহবণিক উদরপরায়ণ প্রভৃতি টাইপ চরিত্রের মিথ্যাচার, ভ্রষ্টতা, লোভ, বিকৃতি ইত্যাদি আমাদের ঘৃণামিশ্রিত কৌতুক উদ্রেক করে। কিন্তু ইহাদের, আপাত কৌতুকজনকতার তলদেশে ইহাদের স্বভাব ও আচরণের যে ঘৃণ্যতা বিদ্যমান তাহা আমাদের স্থায়ী ধিক্কারবোধ জাগ্রত করে। স্ত্রীচরিত্রগুলির সরস আলাপ ও রঙ্গরসিকতা আমাদের আপাত আনন্দ দেয়। কিন্তু সেই আনন্দের তরঙ্গাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে গভীর বেদনা ও সহানুভূতির পলিমাটি আমাদের চিত্তে সঞ্চিত হইতে থাকে। সুতরাং এ নাটকের বাহ্য তরল হাস্যধারার একটি কৃত্রিম আবরণের তলায় ক্ষোভ ও বেদনার ঘনীভূত প্রবাহ বিদ্যমান। সে জন্য আমাদের ক্ষণকালীন হাসির আলো মুহূর্ত মধ্যে সমস্যার গুরু মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। এ নাটককে হাস্যরসাত্মক নাটক কিংবা প্রহসন বলা চরম ভ্রান্তি মাত্র।"

৩০১.১.৩.২ : কুলীনকুলসর্বস্বে সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভাব

সংস্কৃত-বিদ্যায় পারঙ্গম নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁর 'কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক' রচনায় সংস্কৃত নাটকের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ উভয় বৈশিষ্ট্যের প্রভাবকেই গ্রহণ করেছেন। বিশ্লেষণের মুখে আমরা এই প্রভাবকে স্বীকার করার স্বরূপটি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারি।

বহিরঙ্গ গঠনরীতির দিক থেকে কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকটি সংস্কৃত নাটকেরই মতো ছয়টি অঙ্কে সমাপ্ত। নাটকটির আরম্ভে নান্দী ও প্রস্তাবনা এবং শেষ অংশে ভরতবাক্য সংযুক্ত হয়েছে। সংস্কৃত নাটকের নান্দীর দেববন্দনার মতো 'শিশু শশী শোভে ভালে বপু বিভূষিত কালে' শীর্ষক শিববন্দনাটি যুক্ত আছে। সংস্কৃত নাটকের 'নান্দ্যন্তে সূত্রধার'-এর রীতি মেনে এ নাটকেও সূত্রধার প্রবেশ করেছে। সূত্রধারকে নটীর সম্বোধনও

সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসারী। নটী সূত্রধারকে সম্বোধন করে বলেছে — 'আর্যপুত্র! এই আমি আসিলাম, আজ্ঞা করুণ, কি করিব।' সূত্রধার নটীকে নির্দেশ দিয়েছে — '..... সজ্জন-সমাজে সঙ্গীত আরম্ভ কর।' সূত্রধার নটীর গান শুনে বলেছে—"প্রিয়ে! সাধু সাধু, উত্তম সঙ্গীত করিয়াছ, তোমার কণ্ঠনির্গলিত, রাগরাগিনীসঙ্কলিত, রসভাবপূর্ণ মধুর সঙ্গীতশ্রবণে সমস্ত সামাজিক লোক একতানান্তঃকরণে চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় হইয়া রহিয়াছেন, ইহারা প্রথমতঃ তোমার লোকাতীত রূপলাবণ্য নিরীক্ষণেই মুগ্ধপ্রায় ছিলেন, এক্ষণে তোমার অসামান্য সঙ্গীতনৈপুণ্যে যে কি পর্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন, তাহা বাক্‌পথাতীত।" এখানে 'বাক্‌পথাতীত'-এর প্রভাব লক্ষ করার মতো, যা লেখক নিজেই শব্দটির উল্লেখ করেছেন। সূত্রধারের উক্তিতে রাজা, রাজ্য ও কবির নাম উল্লেখ করা সংস্কৃত নাটকের রীতি। এ নাটকেও সেই একই রীতির মান্যতা আমরা লক্ষ করবো। সূত্রধার রাজার উল্লেখের মতোই এ নাটকের পোষ্টা জমিদার ও নাট্যকারের নাম উল্লেখ করে বলেছে—"...সম্প্রতি রঙ্গপুরান্তর্গত কুম্ভী-নগরনিবাসী যশোরাশী শ্রীল শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র চতুর্ধুরীণ মহোদয়ের মতানুসারে শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন মধুর সাধু ভাষায় যে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নামক অপূর্ব নাটক রচনা করিয়াছেন। তৎপ্রস্তাব দ্বারা সমীহিত সিদ্ধ করিব।" সূত্রধারের উক্তিতে নাট্যকারের কথামুখের তথা নাট্যবস্তুর উপস্থাপনা হয় সংস্কৃত নাটকে। এখানে অনুরূপ রীতি অনুসৃত হয়েছে। 'বিবাহ নির্ব্বাহবিধি বিধির ঘটনা'—সূত্রধারের এই কথার সূত্রধরে কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছেন। এও সংস্কৃত নাট্যরীতির কথোদ্ঘাত প্রস্তাবনারই অনুসৃতি। নেপথ্য থেকে শুরু হয়েছে কুলপালকের সংলাপ — 'সাধু, ভরতপুত্র সাধু, প্রজাপতি নির্বন্ধ ব্যতীত কখন বিবাহ ব্যাপার সমাধা হয় না।' আর মঞ্চে উপস্থিত হয়ে নিজের স্বগতোক্তি শুরু করেন,—"বিবাহ নির্বাহবিধি বিধির ঘটনা" সত্যকথা, যথার্থ, মিথ্যা নয়, সংগত বটে। আমি বন্দ্যঘটীয় কেশব চক্রবর্তীর সন্তান, প্রধান কুলীন, আমার কন্যাদিগের বিবাহ হয় নাই, অদ্যাবধি বিধি তাহাদিগের প্রতি প্রতিকুল থাকায় সমযোগ্য পাত্র প্রাপ্ত হইতেছি না, তাহাতেই নিতান্ত চিন্তিত আছি। .... কন্যাভারগ্রস্ত হইয়া চিন্তা-নিমীলিত নয়নে বিনিদ্রাবস্থায় যামিনী যাপন করি। হায় কি ক্লেশ!" এই অংশের সঙ্গে ড. অজিতকুমার ঘোষ মনে করেন মুদ্রারাক্ষসের আরম্ভের মিল আছে। এই নান্দীও প্রস্তাবনা অংশ সংস্কৃত নাটকের রীতি হওয়ায়, পাশ্চাত্ত্য রীতির নাটকে যেমন নাট্যোৎকণ্ঠা আদ্যোপান্ত বজায় থাকে, সংস্কৃতে তেমন থাকেনা। কারণ বিষয়বস্তু আগেই দর্শকদের জানা হয়ে যায়। কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে দেখা যায় গদ্য এবং পদ্য দুই ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে। বিষয় অনুসারে ভাষারীতির স্বাতন্ত্র্যও লক্ষণীয়। পদ্য বলতে তখনকার দিনে প্রচলিত পয়ার-ত্রিপদীর ব্যবহার ঘটেছে। এ ক্ষেত্রেও সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রয়োগ ঘটেছে। পদ্য সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে পরোক্ষ বিবৃতির ক্ষেত্রে। যেমন রসিকার মুখে কুলপালকের কন্যাদের বিয়ের বর্ণনা, ফুলকুমারীর আত্মকাহিনীর বর্ণনা, ফলারের বর্ণনা। পদ্য সংলাপের আরো ব্যবহার হয়েছে আত্মগত বেদনার উচ্ছ্বাসে, খেদ ও বিলাপে এবং প্রকৃতি বর্ণনায়। কামিনী কিংবা মাধবীর বসন্ত প্রভাবিত মানস প্রতিক্রিয়া বর্ণনায়ও পদ্য সংলাপ। নারীদের পতিনিন্দা ও বিবাহ সভায় আগত বৃদ্ধ বরের বর্ণনায়ও সেই পদ্যরীতির ব্যবহার। এই যে বিষয় অনুসারে ভাষায় রীতিগত বৈচিত্র্য, তা সংস্কৃত নাট্যরীতির অনুসারী। নাট্যশাস্ত্রে অতিভাষা, আর্যভাষা, জাতিভাষা ও যোন্যন্তরী চার রকম ভাষায় কথা বলা হয়েছে। অতিভাষা দেবতাণের ভাষা, আর্যভাষা রাজগণের ভাষা, জাতিভাষা সাধারণ মানুষের এবং যোন্যন্তরী ভাষা মানবেতর প্রাণীর ভাষা। জাতিভাষা আবার দুরকম — সংস্কৃত ও প্রাকৃত। কিন্তু 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক যেহেতু বাংলা ভাষায় রচিত নাটক, তাই পাত্রপাত্রীর ভাষাকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় বিভক্ত করার উপায় নেই। তাই নাট্যকার তাঁর মাত্রাজ্ঞান দিয়ে এই দুইভাষার ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্যকে এ নাটকে সঞ্চার করতে পরেছেন। সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য সংস্কৃত শব্দবহুল, সমাসবদ্ধ পদযুক্ত, চিত্রময় এবং সাধুক্রিয়াযুক্ত ভাষায় নির্মাণে ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্যদিকে প্রাকৃত ভাষার বৈশিষ্ট্যকে আয়ও

করেছেন তদ্ভব শব্দ সমাসহীন পদ ও চলিত ক্রিয়াযুক্ত ভাষা ব্যবহার করে। কুলপালক, শুভাচার্য ধর্মশীল প্রভৃতি শিষ্টজনেরা সংস্কৃতানুসারী ভাষায় কথা বলেছে, অন্যদিকে অধর্মরুচি, উদরপরায়ণ। বিবাহবণিক, অভব্যচন্দ্র প্রভৃতি অশিষ্ট জনেরা প্রাকৃতানুসারী ভাষায় কথা বলেছে। আবার ভরত যে ভাষাকে বিভাষা বলেছেনস ভৃত্য ভোলা সেই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেছে। ভাষা ব্যবহারের এই রীতি সংস্কৃত নাটকেরই মতো।

সংস্কৃত নাটকে সন্ধ্যা কি মধ্যাহ্ন সময় বোঝানোর জন্য সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহার করা হতো। এ নাটকেও সেই একই রীতির ব্যবহার—

সূর্য্যের আতপে আর পৃথিবীর তাপে।

নাহিক ক্লেশের লেশ আছি মনস্তাপে।।

আবার — গগন হইতে রবি অনল সদৃশ ছবি

পড়িল পশ্চিম জলধিতে।

সংস্কৃত নাটকে একই মঞ্চে বিভিন্ন দৃশ্যের অবতারনা করা হতো, যা এ নাটকেও করা হয়েছে। যেমন চতুর্থ অঙ্কে ভোলা মঞ্চে প্রবেশ করে বলেছে 'এই মোর ঝীয়ের ঘর'। সেই একই দৃশ্যে 'তবে যাই' বলে সে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে বলে — "ঐ পুরুত ঠাকুরের বাড়ি দেক্‌কে পাচ্ছি, শালার বামুন কদ্দুরে ঘর বানিয়েচে?" একই মঞ্চে ভোলার বিচরণের মধ্যে বিভিন্ন স্থান কল্পনা, ঐ একই দৃশ্যে ধর্মশীল পুরোহিতের উক্তি—"এই যে কুলপালকের বাড়ি চল প্রবিষ্ট হওয়া যাক।" এও সেই সংস্কৃত নাট্যপদ্ধতির ফল।

'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে পঞ্চাননের মুখে আমরা 'শরীর লোহিত বর্ণ স্থলিত গমন'। প্রভৃতি যে শ্লোকটি পাই, কিংবা ঐ দৃশ্যে অভব্যচন্দ্রের মুখে যে শ্লেষাত্মক সংলাপ পাই তাও সংস্কৃত নাট্যরীতির অনুসারী। এরকম শিষ্ট পদের ব্যবহার সংস্কৃত নাটকের রীতি ছিল।

একথা হয়তো ঠিক যে, হাস্যরস সৃষ্টিতে এ নাটকে সর্বত্র সুরুচির মুখ রক্ষিত হয়নি। কিন্তু অশ্লীলতা কোথাও স্থান পায়নি। ষষ্ঠ অঙ্কে অভব্যচন্দ্রের মুখ দিয়ে যে হাস্যকোতুক সৃষ্টি করা হয়েছে, তার আদর্শ শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটক। অভব্যচন্দ্র নিজের পুরাণ জ্ঞান জাহির করে বলেছে—

পুরাণে নবীন বিদ্যা হয়েছে আমার।

রাবণ উদ্ধরে কহে শুন সমাচার।।

ইতিহাসজ্ঞানও তার কম কিছু যায়না

শ্রীমন্ত করিয়া কোলে বেহুলা নাচনী।

রথের তলায় ওই দেখলো সজনী।।

পঞ্চানন বলে সত্যপীরের বারতা।

ব্যাধের রমনী আমি হবে মোর সতা।।

ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টিতে অবশ্য রামনারায়ণ সংস্কৃতানুসারী হতে পারেননি। কারণ বিখ্যাত কোনো কাহিনী নিয়ে তিনি নাটক রচনা করেননি। বিষয়বস্তু সবসময় এ নাটকে সংহত হয়নি, সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী

বহু উপকাহিনী জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃত রীতি অনুসারে এ নাটকে নিন্দনীয় বিষয়ের প্রকাশ ঘটলেও এটি প্রহসন হয়ে ওঠেনি। কারণ প্রহসনে দুটি বা একটি অঙ্ক থাকে।

নাটকটির বিষয় অনুসারে চরিত্র নির্মিত হয়েছে বলে রাজবংশজাত চরিত্র নিয়ে এ নাটক রচনা সম্ভব হয়নি। কৌলীন্যপ্রথার কুফল দেখাতে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষকে নিয়ে এ নাটক রচিত হয়েছে। সংস্কৃত রূপকের প্রকরণশ্রেণীর সঙ্গে এ নাটকে মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

৩০১.১.৩.৩ : আর্দশ প্রশ্নাবলী

১। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক না প্রহসন? আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

২। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে সংস্কৃত নাট্যরীতির কিভাবে অনুসৃত হয়েছে আলোচনা করো।

৩। 'কুলীনকুলসর্বস্ব'-র নাট্য গঠনে নাট্যকারের কৃতিত্ব এবং ব্যর্থতা নিরূপণ করো।

৪। '"কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটিতে সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়।"—এই অভিমতটি দৃষ্টান্তসহ বিচার করো।

৫। সূচনাপর্বের প্রথম বাংলা মৌলিক নাটকরূপে 'কুলীনকুলসর্বস্ব'-এর সাফল্য ও ব্যর্থতাগুলি নিরূপণ করো।

————

একক - ৪

সংলাপ

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.১.৪.১ : সংলাপ

৩০১.১.৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০১.১.৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০১.১.৪.১ : সংলাপ

ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের সংলাপ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা উদ্ধার করছি —

প্রথমেই বলা ভাল, প্রস্তুতি পর্বের বাংলা নাটকে সংস্কৃত তৎসম শব্দের আধিক্য ছিল। তারাচরণ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ কিংবা মধুসূদন ইংরাজি জেনেও সংস্কৃত গন্ধী সংলাপ চরিত্রের মুখে বসিয়েছেন। তার উপর রামনারায়ণ সংস্কৃত পণ্ডিত এবং ইংরাজির সঙ্গে অপরিচিতও। কাজেই এই প্রথম পর্বের নাটকে যে যে বিষয়গুলি কুলীনকুলসর্বস্বর নাট্যসংলাপকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, সেগুলি হল—

ক. এই নাটকে কোনো 'Scene'-এর ব্যবহার নেই, আছে কেবল অঙ্ক বিভাগ।

খ. নাট্যকারের কথায় 'ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে।'

গ. গল্পের মধ্যে নাট্যকার নানা হাস্যরসের প্রয়োগ করায় ট্র্যাজেডি ও হিউমারের সমন্বয়।

কুলীনকুলসর্বস্বের শুরুতে প্রথমে নন্দী। সূত্রধার এখানে প্রকাশ্য সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকারের পরিচিতি ছিল। তারপরই নটীর গান। এখানে সংলাপ ও সঙ্গীতের মেলবন্ধন ঘটেছে। সূত্রধার এবং নটীর কথাবার্তায় বিবাহ নিয়ে যে সমস্যা উঠে এসেছে তাই পরবর্তীস্তরে কুলপালক-পরিবারের বিবাহ সমস্যায় প্রসারিত হয়েছে। এই Turning point না থাকলে নাট্যসংলাপে গতি আসতে পারত না। কাজেই নাট্যসূচনার সংলাপ অবশ্যই শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছে। অতঃপর কুলপালকের সঙ্গে উপস্থিতি ও স্বগতোক্তি পরবর্তী নাট্যপ্লটের সূচক —

কুলপালক – 'বিবাহ নির্ব্বাহবিধি বিধির ঘটনা' সত্য কথা, যথার্থ মিথ্যা নয়, সঙ্গত বটে। আমি বন্দ্যঘটীয় কেশব চক্রবর্তীর সন্তান, প্রধান কুলীন, আমার কন্যাদিগের বিবাহ হয় নাই, অদ্যাবধি বিধি তাহাদিগের প্রতি প্রতিকূল থাকায় সময়োগ্য পাত্র প্রাপ্ত

হইতেছে না, তাহাতেই নিতান্ত চিন্তিত আছি। দেখ, আমার সংসার রাজসংসার বলিলেও বলা যায়, কিছুই অনটন নাই, কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় না, কিন্তু দেখ দেখি দৈব বিড়ম্বনা, কিছুতেই মনস্তুষ্টি হইতেছে না; কন্যাভারগ্রস্ত হইয়া চিন্তা নিমীলিত নয়নে বিনিদ্রাবস্থায় যামিনী যাপন করি। হায় কি ক্লেশ। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন 'হ্রস্ব গৃহাঃ স্থূলটা যাব গোধুমশালিনঃ। প্রলযেহপি ন সীদন্তি যদি কন্যা না জায়তে।' ইহা যুক্তিসিদ্ধ বটে, কন্যাজন্মই গৃহস্থাশ্রয়ীর অশেষ ক্লেশদায়ক। বিশেষতঃ অস্মাদৃশ কুলীন সন্তানদিগের। প্রত্যুত দেখ বিধাতার কি বিড়ম্বনা। আমার গৃহে কন্যাচতুষ্টয় অবতীর্ণ হইয়াছেন। এক কন্যাই কুলীনদিগের বিপৎ-পরম্পরা সম্পাদন করে, অধিকের কথা কি বলিব?

১৮৫৪ সালে লেখা এ নাটকের প্রথম অভিনয় হয় রামজয় বসাকের বাড়িতে, ১৮৫৭ সালের মার্চে। সেই অভিনয়ে কলকাতায় সাড়া পড়ে যায়, ফলে ১৮৫৮-র মার্চে, গদাধর শেঠের বাড়ীতে নাটকের তৃতীয় অভিনয়ের সময় রঙ্গভূমি পরিপূর্ণ হয়েছিল বলে 'সংবাদ প্রভাকর' জানাচ্ছে। এই জনপ্রিয়তার পিছনে কুলপালকের বিভিন্ন সংলাপ অন্যতম কারণ। তখনকার দিনে এমন অজস্র কুলপালক ছিল, যাদের যে কোনো ভাবে, মেয়েদের সুখের কথা না ভেবেই, কুলরক্ষার প্রয়োজনে, তাদের বিয়ে দিত। হতে পারে, নাট্যতত্ত্ববিদ্‌দের বিচারে, কুলপালক এক প্রতিবাদহীন, তীব্র দ্বন্দ্বহীন চিরত্র, কিন্তু তার ট্র্যাজেডির তো সীমা নেই। একথাও ঠিক নাটকে কুলধন নামে আর এক পিতা মানসিকভাবে কিছুটা প্রতিবাদী, কিন্তু কুলপালকের সংলাপ খুঁটিয়ে দেখলে তার অন্তর্দ্বন্দ্বও অবশ্যই চোখে পড়বে —

কুলপালক — কে হে? বন্ধু নাকি, এত রদ্দুরের বেলা মেলা কি বক্‌চোহে, কেন এত রাগত কেন?

কুলপালক — বলি, ভাই তোমার দেশের খুরে দন্ডবৎ, এমন দেশ কোথাও দেখি নাই।

কুলধন — যথার্থ ভাই, এ দেশে খাদ্য কিছুই পাওয়া যায় না; হাট নাই, তরকারির মধ্যে পুঁইশাগ, গব্যের মধ্যে তেঁতুল, দেশে থাকাই দুঃসাধ্য।

কুলপালক — না, তা না হে।

কুলধন — তবে, দেশের প্রতি ত্যক্ত কেন?

কুলপালক — আমার মেয়েদের বিবাহ হইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে, তা এমন কি কারু হয় না, সংসার করিতে হইলে সকলেরি কি সকল কর্ম্ম সময়ে হইয়া থাকে, কিছুতেই কি বিলম্ব হয় না? তা বিলম্বই বা কি, বৈদিক ব্রাহ্মণের ন্যায় কি গর্ভে গর্ভে বিবাহ দিব? দেশের লোকের তাহা বিবেচনা করে না, নিরপরাধে আমাকে নিন্দাবাদ করিতেছে, ভাই তুমি বিবেচনা কর দেখি সমযোগ্য পাত্র না পাইলে কেমনে বিবাহ দি? কি এখন যার তার সঙ্গে বিবাহ দিয়া চিরন্তন কুল জলাঞ্জলি দিব?

সমস্যাসঙ্কুল পরিবেশেও নাট্যকার Satire-এর ব্যবহার করায় হাসি-কান্নার যুগলবন্দী ঘটেছে উপরের সংলাপে। 'কুলীনকুলসর্বস্বে' হাস্যরস প্রয়োগের সময়, দুই বিপরীত মানসিকতার ঘটক নাট্যকার হাজির করে, কুলীন পরিবারের কন্যার দুঃখদীর্ণ রূপটি নির্মমভাবে ফুটিয়েছেন। সংলাপই এক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যের

হাতিয়ার —

শুভাচার্য্য — আমি শুভাচার্য্য শর্ম্মা, রাঢ়দেশীয় ত্রিপুরাপুরে নিবাস, কলিকাতার ঘোষাল, সুগৃহীত নাম, আর্য্যকুলাচার্য্যের পুত্র, পশ্যের সন্তান।

অনৃতাচার্য্য — অহং ঘটক, অনৃতাচার্য্য চূড়ামণি। তোমার পিতামহের নাম কি হে?

শুভা — মহাশয়। আপনি ঘটক চুড়ামণি, আপনার অবিদিত কিছুই নাই, আপনিই বলুন।

অমৃত — (ঈষৎ হাস্য করিয়া) শুনিবে। বাপুহে বংশাবলি ত আমার নয়নপথে রহিয়াছে। আমরা তেমন ঘটক নই, ফাঁকিজুকি নাই। চণ্ডীপুরে কিনুরাম ঘোষাল বাস করিতেন, কেমন তেমন ঘটক নই, ফাঁকিজুকি নাই। চণ্ডীপুরে কিনুরাম ঘোষাল বাস করিতেন, কেমন সত্য কি না?

শুভা — বলুন্ শুনা যাউক।

অনৃ — সেই কিনুরামের পুত্র হরিনাথ, হরির পুত্র মহেশচন্দ্র পুত্র নিমাইচরণ, নিমাইয়ের পুত্র বলরাম ও রামরাম, বলরাম নিঃসন্তান। রামরামের পুত্র গোকুলচন্দ্র, তাঁহার পুত্র কেশব, শঙ্কর ও গঙ্গাধর, তন্মধ্যে গঙ্গাধর নিঃসন্তান, শঙ্করের পুত্র শ্যামসুন্দর, তাঁহার পুত্র বৈদ্যনাথ, তিনিও নিঃসন্তান; অতএব গঙ্গাধর ও শঙ্করের বংশ নাই। কেশবের পুত্র হরিহর ও কবিবর, কবিবর মাতামহ সম্পর্কে গৌহাটিতে বাটী করিয়াছিলেন, হরিহরের পুত্র মাধবচন্দ্র, তিনি ত্রিপুরাপুরে উঠিয়া যান, সেই মাধবের পাঁচ পুত্র — শঙ্করাচার্য্য, ব্যাসাচার্য্য, জ্ঞানাচার্য্য, ধর্ম্মাচার্য্য ও কুশলাচার্য্যই তোমার পিতামহ, কেমন পাইয়াছ কি না? আমি কি জানি না 'পঞ্চগোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, ইহা ছাড়া বামন নাই'। আমার অবিদিত কোনো ঘর আছে?

শুভ — আপনকার পিতৃঠাকুরের নাম শুনিতে ইচ্ছা করি।

অনৃ — আঁ, কি বলো হে? কালি রাত্রে নিদ্রা হয় নাই, বড় গ্রীষ্ম।

শুভা — মহাশয়ের পিতার নাম কি?

অনৃ — বড় মশা।

শুভা — (উচ্চৈঃস্বরে) বলি আপনি কার পুত্র?

অনৃ — অধিক দিন হইল আমার পিতৃঠাকুরের পরলোক হইয়াছে।

শুধু করুণ নয় হাস্যরসেও যে জাত শিল্পী ছিলেন রামনারায়ণ দুই ঘটকের সংলাপে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। অনৃতাচার্য্যদের মতো লোভী ঘটকের সংসারে বেশি, এরা অর্থ ছাড়া কিছুই জানে না। এদের ধর্মাধর্মভাব নেই, তাই কুলপালকের কন্যার জন্য সে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে পাত্র হিসেবে হাজির করায়। বিপরীতে শুভাচার্য্যরা সংখ্যায় অঙ্গুলিমেয়। নাট্যকার এই সৎ ঘটকের সংলাপকে আরও ক্ষুরধার এবং শ্লেষাত্মক করলে দর্শকরা আরও আনন্দ পেতো, সন্দেহ নেই। সেই আনন্দের খোরাক আছে উদরপরায়ণের

কিংবা বিবাহবাতুলের সংলাপে। বেশ কটি নারী চরিত্র আছে, যাদের সংলাপে কোথাও চমৎকারিত্ব, কোথাও অতিরিক্ত ভাঁড়ামি।

ক. শান্তবীর সংলাপের বিদ্রোহিনী নারীর পরিচয় আছে — 'তা চল না ভাই, ঘরে তো বাবাকে বলি এমন বে দিলেই হয় না?'

খ. যশোদা পরিণত বয়স্কা, বিধবা। অল্পবয়সী পতিপরিত্যক্তা কন্যাদের প্রতি পরম মমতায় যেন সে বলে —

বল্লাল হইয়া কাল দিয়াছে কুলে শাল
সামাল সামাল ডাক ছাড়ি।
না হল বাসনা পূর্ণ কেবল বৈধব্য তূর্ণ
মন্ত্রের প্রভাবে উদম্ রাঁড়ি।।

ত্রিপদী ছন্দের সংলাপ না হলে, চরিত্রটি যেমন আরও বৈচিত্র্যময় হতো তেমনি নাটকও গতিময় হতো। পয়ার ছন্দে উচ্চারিত ফুলকুমারীর সংলাপেও এই ত্রুটি দেখি। আবার এর বিপরীতটাও পাই ছন্দে রচিত ভোলার স্বগতোক্তির মধ্যে। তার কারণ পদ্য থেকে সরাসরি আঞ্চলিক কথ্য সংলাপে ঢুকে —

ভোলা – (স্বগত) মোগার কপালে দুক্ নেকেচে গোঁসাই।
খাটি খাটি মনু এই বষ্টি পাই নাই।।
বসি ঘরে প্যাট ভরে খাতি নাই পাই।
চাকুরি ঝকমারি কাম করি মুই তাই।।

ঐ ওত্তরের বাড়ির মুই খ্যানাকাট্টে গেহালাম, এস্তে এস্তেই বড়মোশাই বল্যে 'ওরে ভোলা, তুই যা, পুরুট্ ঠাকুরের ডাকি অন্', তা এই মুই অদ্দুরে থাকি আলাম, তামুক্ খাতিও পালাম্ না, এট্টু জিরুতিও পালাম না, তাই ত মোদের বৌ বলেহালো, বলে, 'চাকুরি না কুকুরি', তা খাতিপত্তি পাই নে, না করে কি কর্ব্বো? মুনিব যা বলে তা না কল্যে মেইনে দেবে কেন? খ্যাদারে দেবে যে, তাই যাচ্চি, আসি তবে তামুক খাব। (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া) ঐ ঝাঃ কেচ্চেখানা ভুলি আলাম্, দাদাঠাকুর বল্যে 'এসবের এট্টা থোঁরের গাচ অনিস্' তা কি দি কাট্‌বো? আবার ফিরি যাব? (চিন্তা করিয়া) না বেনে, পদেদ্ধারে মোর ঝীয়ের ঘর, সেইন্থেই ন্যাবো। (কিয়দ্দুর গিয়া) এই মোর ঝীয়ের ঘর; এখন ঝী মোর হেতা নেই তা বীন্‌কে ডাকি। (প্রকাশ্যে) ও বীন্! বীইন্! একবার তোগার কেচ্চে খান দিবি? (আকাশে কর্ণ দিয়া) আঁ কি বল্লি? হেরিয়ে গেছে?

সুতরাং যতই সংস্কৃতগন্ধী সংলাপ বর্তমান নাটকে থাকুক না কেন, চরিত্রানুগ সংলাপ অবশ্যই বৈপরীত্ব সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, রামনারায়ণ যদি আরও দু-দশক পরে কলম ধরতেন তাহলে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্বে'র সংলাপ আরও ঝরঝরে হতো। তবে চপলা-সুলোচনা- চঞ্চলার সংলাপে উনিশ শতকের নারীদের কথ্য সংলাপে যে নিপুন নিদর্শন রামনারায়ণ টেনেছেন তাতে নাটকের জনপ্রিয়তায় নিহিত উৎস বোঝা যায়।"

৩০১.১.৪.২ : আর্দশ প্রশ্নাবলী

১। কৌলীন্যপ্রথা কিভাবে সামাজিক ব্যভিচারের জন্ম দিয়েছিল 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক অবলম্বনে তার পরিচয় দাও।

২। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের সংলাপগত বৈশিষ্ট্যগুলি দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

৩। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটিতে প্রথম মৌলিক নাটক রূপে চিহ্নিত করা যায় কি? তোমার উত্তরের সমর্থনে দৃষ্টান্ত এবং যুক্তি দাও।

৪। 'কুলীনকুলসর্বস্ব'–নাটকটির নামকরম কতদূর সার্থক হয়েছে তা, আলোচনা করে দৃষ্টান্ত সহযোগে বুঝিয়ে দাও।

৩০১.১.৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক — সম্পাদনা শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, সাক্ষর প্রকাশনী, ১৯৭৭।

২। বাংলা নাটকের ইতিহাস — ড. অজিতকুমার ঘোষ, প্রথম দে'জ সংস্করণ জানুয়ারী-২০০৫।

৩। রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনাবলী, মুখবন্ধ — ড. অজিতকুমার ঘোষ, সাহিত্যলোক

৪। বাংলা প্রহসনের আলোকে উনিশ শতকের বাঙলা ও বাঙালী সমাজ — মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, বাংলা একাডেমী : ঢাকা, ১৯৮৫।

৫। সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক — গোলাম মুরশিদ বাংলা একাডেমি: ঢাকা, ১৯৮৪ - ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

————

পর্যায়গ্রন্থ - ২

একক - ৫

ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে 'কৃষ্ণকুমারী'র সার্থকতা

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.২.৫.১ : ভূমিকা

৩০১.২.৫.২ : নাট্যকার মধুসূদন ও নাট্যবৈশিষ্ট্য

৩০১.২.৫.৩ : ঐতিহাসিক নাটক — সংজ্ঞা-স্বরূপ বৈশিষ্ট্য

৩০১.২.৫.৪ : ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে লেখা কিছু গ্রন্থ

৩০১.২.৫.৫ : কৃষ্ণকুমারী নাটকের কাহিনী ও মধুসূদন

৩০১.২.৫.৬ : কৃষ্ণকুমারী নাটকের গঠনকৌশল

৩০১.২.৫.৭ : ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে 'কৃষ্ণকুমারী'র সার্থকতা

৩০১.২.৫.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০১.২.৫.১ : ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন মূলত কবি হিসেবে, বিশেষত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক হিসেবেই খ্যাত। তিনি বাংলা থিয়েটার ও নাটকের ক্ষেত্রে এক বিশেষ যুগে যে প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন সেকথা সচরাচর আলোচিত হয় না; সর্বোপরি তাঁর কাব্যপ্রতিভা নাট্যপ্রতিভাকে ক্ষুন্নতো করেইনি বরং তা আরও সমৃদ্ধ করেছে।

মধুসূদন দত্তের নাট্যরচনার প্রথম প্রেরণা বেলগাছিয়া নাট্যশালা ও তার পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ যেমন, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখেরা। বেলগাছিয়া নাট্যশালা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠার পর নতুন বাংলা নাটকের চাহিদা বিশেষভাবে উপলব্ধ হয়। উদ্যোক্তারা তৎকালীন যুগের খ্যাতনামা নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নকে শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটক বাংলায় অনুবাদ করে তা বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্য দেন। ইউরোপীয় ও অবাঙালি দর্শকদের কাছে নাটকটি উপভোগ্য করে তোলার জন্য তারা 'রত্নাবলী'র ইংরেজি অনুবাদ মুদ্রণের মনস্থ করেন। মধুসূদনের অকৃত্রিম বন্ধু এবং উক্ত নাট্যশালার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক

গৌরদাস বসাকের মধ্যস্থতায় 'রত্নাবলী' অনুবাদ করতে গিয়েই মধুসূদনের মনে প্রথম নাট্যচিন্তা জাগ্রত হল। এ প্রসঙ্গে মধুসূদনের জীবনচরিত রচয়িতা যোগীন্দ্রনাথ বসু মন্তব্য করেছেন—

"রত্নাবলীর এই ইংরেজী অনুবাদ হইতে মধুসূদন তাঁহার জীবনের গন্তব্যপথ প্রাপ্ত হইলেন।"

(মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত ঃ পৃ-১৫৯)

একদিন 'রত্নাবলী'র রিহার্সাল দেখতে দেখতে মধুসূদন গৌরদাসবাবুকে বললেন—"দেখ, কি দুঃখের বিষয় যে, এই একখানা অকিঞ্চিৎকর নাটকের জন্য, রাজারা এত অর্থব্যয় করিতেছেন।" গৌরদাসবাবু শুনে বললেন—"নাটকখানা যে অকিঞ্চিৎকর তাহা আমরাও জানি; কিন্তু উপায় কি? বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় নাটক আমরা অভিনয় করি, ইহা অবশ্যই তোমার ইচ্ছা নয়। ভাল নাটক পাইলে, আমরা 'রত্নাবলী' অভিনয় করিতাম না, কিন্তু ভাল নাটক বাংলা ভাষায় কোথায়?" মধুসূদন বললেন, "ভাল নাটক? আচ্ছা, আমি রচনা করিব?"

শুরু হল নাট্যরচনা। তিনি অনুভব করেন সংস্কৃত নাটকের নিরস আক্ষরিক অনুবাদ কখনই প্রকৃত নাটক সৃষ্টির উপযোগী হবে না। উপরন্তু তিনি দর্শকদের মৌলিক বাংলা নাটকের প্রতি আগ্রহের কথা স্মরণ রেখেই প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) রচনা করেন। 'শর্মিষ্ঠা'র প্রস্তাবনায় শুধু বাংলা নাটকের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থাই প্রকাশ পায়নি, ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকারদের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাও প্রকাশ পেয়েছে, তিনি লেখেন—

"... ... কোথায় বাল্মীকি ব্যাস কোথা তব কালিদাস
কোথা ভবভূতি মহোদয়?
অলীক কুনাট্যরঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।"

(জীবন চরিত ঃ পৃ-১৭২)

'শর্মিষ্ঠা' নাটক লেখার অনেক আগে থেকেই মধুসূদন দত্ত গ্রীক ও ইংরেজি নাটক বিশেষত শেক্সপীয়রের নাটকের সঙ্গে খুবই পরিচিত ছিলেন।

তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) গ্রীক পুরাণের ছায়াপাতে রচিত হয়েছে। 'পদ্মাবতী'র আখ্যায়িকাটি যদিও গ্রিক পুরাণ থেকে পরিগৃহীত তথাপি মধুসূদন দত্ত একে এমন দেশিরূপ দান করেছেন, তাঁর অনুকরণাংশও মৌলিক বলে মনে হয়।

অতঃপর রাজপুতদের ইতিহাস নিয়ে তিনি লিখলেন 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১)। রচিত হল বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি নাটক। এছাড়া তিনি 'রিজিয়া' ও 'মায়াকানন' (১৮৭৪) নামে দুখানি নাটক রচনা করেন। ১৮৬০ সালের গোড়াতেই পুরো ইউরোপীয় ধাঁচে রচনা করলেন 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা?' নামক দুটি প্রহসন। বলা বাহুল্য যে, এই দুটি প্রহসনই প্রথম বাংলা সাহিত্যের সার্থক প্রহসন।

৩০১.২.৫.২ : নাট্যকার মধুসূদন ও নাট্যবৈশিষ্ট্য

মধুসূদন মূলত নিজের পায়ের ওপর অর্থাৎ কোনো কিছুর দাসকতা না করে মৌলিক নাটক রচনায় উৎসাহী হন। তাঁর নিজস্ব চিন্তা ভাবনা ছিল নাট্যাদর্শের প্রতি; কখনই সংস্কৃত নাটকের দাসসুলভ মনোভাব তাঁর ছিল না। তিনি বলেছেন—

"I shall look to the great dramatist of Europe for models."

তিনি জোর দিয়ে বলেন—

"আমি একটা নেকটাই বা ওয়েস্টকোট ধার করতে পারি গোটা স্যুট কখনোই নয়।"

অর্থাৎ ইউরোপীয় আদর্শকেও তিনি হুবহু অনুসরণ করবেন না। এতদ্সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রথম নাটক 'শমিষ্ঠা'য় স্বাধীন পথ ও অনুবর্তী হয়ে চলতে পারেননি, কারণ তাঁর দর্শকের অধিকাংশই পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের সঙ্গে বেশি পরিচিত নন, বরং সংস্কৃত নাট্যাদর্শই তাঁদের কাছে অনেক পরিচিত।

(ক) মধুসূদনই প্রথম নাট্যকার যিনি ইংরেজি নাট্যাদর্শ অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন এবং তাঁর প্রথম দুটি নাটকে ইংরেজি নাট্যাদর্শ প্রয়োগ করেন। প্রথমে তিনি সফল না হলেও পরবর্তীতে তিনি সফল হন।

(খ) ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক কাহিনিকে আশ্রয় করে তিনি নাটকের পরিধিকে আরো বিস্তৃত করেন। বিভিন্ন দেশের পুরাণ কাহিনিকে তিনি দেশীয় রূপদান করেন। দেশের লোককে বিদেশের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করার মহান প্রচেষ্টা তাঁর নাটকে মেলে।

(গ) গণসংগ্রামের রূপ তাঁর নাটকেই প্রথম দেখা যায়। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে জমিদারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের রূপ দেখতে পাওয়া যায়। এর ফলেই পরবর্তী নাট্যকাররা এই আদর্শ গ্রহণ করেন।

(ঘ) একটা পূর্ণাঙ্গ আখ্যান কাহিনি যে নাটকের পক্ষে প্রয়োজন তা তিনি প্রথম অনুভব করেন। নাটকীয় দ্বন্দ্ব, সংঘাত-এর ফলপ্রসূত ব্যক্তিজীবনের ওঠানামা তাঁর নাটকে লক্ষ করা যায়।

(ঙ) জাতীয় চেতনা গঠনের ক্ষেত্রে যে বিশেষ শক্তি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে তা হল দেশপ্রেম। এই দেশপ্রেমকে তিনি নাটকের মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন।

(চ) যুগের অস্থিরতা, জাতির কোন্দল, পারস্পরিক কলহ, ঈর্ষা, নারী লোলুপতাকে তিনি নাটকের মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন।

(ছ) নাটক লেখা হয় মুখ্যত অভিনয়ের উদ্দেশ্যে। সাহিত্য বা কাব্য হিসেবে তার অন্যতর আবেদন থাকতে পারে, কিন্তু মঞ্চ ও দর্শকের প্রয়োজনেই নাটকের সৃষ্টি। এ সত্য মধুসূদন জানতেন। তাই তিনি নাটকাভিনয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ জোর দেন।

(জ) মধুসূদনের নাটকে মানুষ, তুচ্ছ, ক্ষুদ্র নয়, দেবতার হাতে নিছক ক্রীড়নক নয়। সে অমিত শক্তি, অপার বীর্যের অধিকারী।

৩০১.২.৫.৩ : ঐতিহাসিক নাটক-সংজ্ঞা-স্বরূপ বৈশিষ্ট্য

ইতিহাস শব্দটি থেকে উদ্ভব হয়েছে 'ঐতিহাসিক' শব্দটি। ইতিহাস শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'এই রূপ ছিল' (ইতি হ আস)। এই 'ছিল'র মধ্য দিয়ে অতীতকালের আভাস পাওয়া যায়। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে—

> "ইতিহাস-এর ক্ষেত্র এখন একটু ব্যাপকভাবে ধরা হয়— জাতির সর্বাঙ্গীণ সংস্কৃতির বিকাশের কথা তাহার ইতিহাসের মধ্যেই আজকাল গৃহীত হইয়া থাকে। ... কোনো জাতির বা মানব সমাজের ইতিহাস হইতেছে, তাহার সভ্যতার ও সংস্কৃতির ইতিহাস।"
>
> (ইতিহাস ও সংস্কৃতি; সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষণের অংশ বিশেষ)

অ্যারিস্টটল কাব্য ও ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করবার জন্য বলেছেন—

> "Poetry is something more Philosophic and of greater important than history, since its statements are of the nature rather of universal, where as those of history are singulars."

'Universal' বা 'সর্বজনীন' কথাটির ব্যাখ্যাকালে তিনি বলে দেন যে, কাব্যে কোনো এক ব্যক্তির সম্ভাব্য ও অপরিহার্য পরিণাম কার্যে বা ঘটনাবলীতে বর্ণিত হয় কিন্তু ইতিহাসে থাকে অনুষ্ঠিত কার্যের বিবরণ। আলকিবাইডেস যা করেছেন অথবা তাঁর প্রতি যা অনুষ্ঠিত হয়েছে তা ইতিহাসের বিষয়। ইতিহাসে থাকে তথ্যের অপক্ষপাত প্রাচুর্য, কিন্তু কবিকে তা থেকে সত্য নির্বাচন করতে হয়। এই নির্বাচনকে আশ্রয় করে তিনি নতুন করে সৃষ্টি করেন। গ্রীসের নাট্যকারগণ প্রচলিত কাহিনি নিয়ে নাটক লিখেছেন কিন্তু সেই কাহিনিকে তাঁরা নতুনভাবে বিন্যস্ত করেছেন। যে কাহিনি ছিল খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত তার মধ্যে ধারাবাহিকতা ও পারম্পর্য এনে এবং কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত করে তাঁরা আখ্যানের (plot) বৃত্ত রচনা করেছেন। ইতিহাসের সুপরিচিত কাহিনি গ্রহণ করলেও কবিকে তা সম্ভাব্য ও অপরিহার্য ঘটনা ধারায় সুবিন্যস্ত ও পরিণাম দান করতে হয়। অ্যারিস্টটলের বক্তব্য হল—

> "And if he should come to take a subject from actual history, he is none the less a poet for that."

'ঐতিহাসিক নাটক' কথাটির অর্থ খুবই ব্যাপক। সি. এফ. টুকার ব্রুক লিখেছেন—

> "The term History Play is difficult of precise theoretic limitation; and in proctise, the differentiation of the strict members of this new type from those plays on historical subjects which follow the more conservative rules of comedy or tragedy is a take approaching impossibility....."
>
> (The Tudor Drama : Chapter - IX ... The History Play)

যেহেতু কবি আপনার যুক্তি ও কল্পনাবলে সত্যকে প্রকাশ করেন, বিক্ষিপ্ত তথ্যরাজি থেকে চরিত্রের স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করেন এবং কাহিনির মধ্যে ধারাবাহিকতা এনে দেন, সেইহেতু ইতিহাসের তুলনায় কাব্যকে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ বলে অ্যারিস্টটল বলেছেন।

ঐতিহাসিক প্রকৃত বৃত্তান্তকে প্রকৃত রূপে গ্রহণ করে বর্ণনা করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু যা প্রকৃত তাও লেখকগণের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়ে থাকে। অসাধারণ লোককে প্রকৃতভাবে জানা আরো কঠিন। অতীত বৃত্তান্ত থেকে তাঁর যথার্থ প্রতিকৃতি নির্মাণ করা কঠিন, কেননা সেই ক্ষেত্রে লেখককে প্রমাণ ও অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। 'কৃষ্ণচরিত্র' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, ইতিহাসমাত্রই বহুল পরিমাণে লেখকের অনুমান ও পাঠকের বিশ্বাশের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কবির অনুমান ঐতিহাসিকের অনুমান অপেক্ষা প্রকৃত ইতিহাসের অর্থাৎ সার্থক সত্যের কাছাকাছি। কবি চিত্রকরের ন্যায় শুধু বহিরঙ্গ রূপ নয়, অন্তরঙ্গ পরিচয় ও ব্যক্ত করেন। ইতিহাস বহিরঙ্গ ঘটনা বর্ণনায় সীমাবদ্ধ থাকে।

ঐতিহাসিক পক্ষপাতপুষ্ট না হলে তথ্যসমূহ পাঠ, নির্বাচন, তুলনামূলক আলোচনা ও যুগ-পরিচয়ের আলোকে যা অনুমান করেন তা বিচারবুদ্ধি আশ্রিত সিদ্ধান্ত। কবি যে প্রকৃত ইতিহাসের সমীপবর্তী হন তার কারণ হল যে, তিনি ইতিহাসের কাহিনিটিকে নতুন করে বিন্যস্ত করেন। উপরন্তু, কবির দৃষ্টি থাকে ইতিহাসের চরিতরসমূহের উপর। তাদের জীবনের আলোকে ঘটনাবলী নতুন তাৎপর্য লাভ করে থাকে।

সাহিত্যের যে কোনো বিভাগে আমরা সমগ্র মানুষকে প্রত্যাশা করে থাকি। সাহিত্যের মধ্যে শেক্সপীয়রের নাটকে, দুর্দু এলিয়টের নভেলে, সুকবিদের কাব্যে সেই প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্ব মুক্তিলাভ করে। তারই সংঘাতে আমাদের মন আগাগোড়া জেগে ওঠে; 'আমরা আমাদের প্রতিহত হাড়গোড় ভাঙ্গা ছাইচাপা অঙ্গহীন জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করি।'

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করে নিই যে, সাহিত্য পাঠের আনন্দের কারণ হল যে, আমরা তার মধ্যে আমাদের নতুন করেও সম্পূর্ণরূপে জানতে পারি। যেহেতু ঐতিহাসিক উপন্যাস যুগনায়ক অর্থাৎ কালের সারথীদের কাহিনী বর্ণনা করে, যাদের উত্থান-পতনের সঙ্গে জাতির ভাগ্য বিজড়িত, তাদের পরিচয় সম্ভূত 'রসাবেগ আমাদিগকে অত্যন্ত নিকটে আসিয়া আক্রমণ করে'। ক্ষণকালের জন্য তাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আমাদেরকে জীবনের ক্ষুদ্র পরিধি থেকে মুক্তিদান করে থাকে। আমরা কালগত ব্যবধান 'ভুলিয়া তাহাদের জীবনধারার সহিত একাত্মতা স্থাপন করিয়া বসি।' একে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের প্রকৃত রসাস্বাদ বলেছেন।

ইতিহাসে অনেক সময় শুষ্ক ইন্ধনের ন্যায় রাশীকৃত তথ্য পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কবির কাব্যে সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আসলে ঐতিহাসিকের লক্ষ থাকে যুগের অভিপ্রায় ও প্রবহমান ধারাকে প্রকাশ করবার দিকে, কিন্তু কবি মানব-জীবনগত সত্যকে প্রকাশ করে রসসৃষ্টি করতে চান। যেহেতু তিনি তথ্যসমূহ সুবিন্যস্ত করে ইতিহাসের ধারা ও মানব চরিত্রকে পরিপুষ্ট করতে চান সেই অর্থে তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। এই কারণে বাল্মীকি রাম-চরিত্রের অজ্ঞতা হেতু তাঁর কাহিনি রচনা করবার জন্য আশঙ্কা প্রকাশ করলে, দেবর্ষি নারদ তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, 'ঘটে যাহা সব সত্য নহে, যা রচিবে সেই সত্য হবে'। যুক্তি ও কল্পনাবলে সত্যকে উদ্ধার করে প্রকাশ করা হল কবির ধর্ম। এই সত্য হল জীবনাশ্রিত রূপ ও রসের সত্য। রসসৃষ্টি ঐতিহাসিক উপন্যাসের একমাত্র উদ্দেশ্য ও এইহেতু ঔপন্যাসিক ইতিহাসের উপকরণ ব্যবহার করে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, আলঙ্কারিকগণ প্রকার নয় প্রকর মূল রসের কথা বলেছেন, কিন্তু সেগুলি ছাড়াও আরও অনেকগুলি মিশ্ররস আছে। এদের একটাকে ঐতিহাসিক রস নাম দেওয়া যায়। এই রস

মহাকাব্যের প্রাণস্বরূপ। ইতিহাসের সংশ্রবে এসে উপন্যাসে যে এক বিশেষ রস সঞ্চারিত হয় তার প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ থাকে। সুতরাং মহাকাব্যে ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের আকর্ষণ হল ঐ রস সৃষ্টি।

ইতিহাসে বর্ণিত পাত্র-পাত্রীগণ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনাবর্ত থেকে বহুদূরে অবস্থিত। তাঁরা আমাদের অভিজ্ঞতার বহির্বর্তী। ইতিহাসে বর্ণিত প্রকৃত ঘটনাবলীর সঙ্গে তাঁদের যুক্ত করে দিতে পারলে সহজে তাঁরা আমাদের বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু এদের সামগ্রিক পরিচয়ের জন্য শুধু ব্যক্তিরূপে নয়, অতীতে যে বৃহৎ রঙ্গভূমিতে তাঁরা কার্যকলাপ করেছেন তারও পরিচয় ও উপলব্ধি অত্যাবশ্যক। ইতিহাসে তাই যুগের পরিবেশ প্রয়োজন। আবার একইকালে চরিত্রের ব্যক্তিরূপ ও বিশ্বরূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলে তা প্রকৃত রসাস্বাদের কারণ হয়।

যে ঐতিহাসিক রসের কথা বলা হয়েছে তা ব্যক্তির রূপ ও স্বরূপকে আশ্রয় করে উদ্ভূত হয়ে থাকে। ইতিহাসের ঘটনাবলীর সম্পর্কে এসে মানবজীবন ও চরিত্রসমূহ সুখ-দুঃখে আলোড়িত হয়ে ওঠে। এর ফলে যে বিষামৃত উদ্ভূত হয় তাই ঐতিহাসিক রস। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে নির্মলকুমারীর কাছে ঔরঙ্গজেবের নিজের নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতাবোধকে ব্যক্ত করবার মধ্যে তাঁর চরিত্রের মানবিক দিকটি উদ্‌ঘাটিত হয়ে আমাদের রসবোধকে তৃপ্ত করেছে। ইতিহাসাশ্রিত ঘটনাবলীর নায়কদ্বয় ঔরঙ্গজেব ও রাজসিংহ তাঁদের সংঘর্ষের ফলে ভারতব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন। তাই ইতিহাসকে কেন্দ্র করে, যেখানে মানবস্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে তাই আস্বাদনযোগ্য সাহিত্যের রস হয়েছে। আবার অন্যদিকে জেবউন্নিসা, মবারক ও দরিয়াকে কেন্দ্র করে যে আবর্ত, আবেগ ও ব্যাকুলতা উপন্যাসের পরিণাম অংশকে কারুণ্যে পূর্ণ করে তুলেছে তার রসাবেদন সমধিক। ইতিহাসের উচ্চচূড় রথের জয়যাত্রার মহিমা আমাদের মনে বিস্ময়বোধকে সচকিত করে তোলে সন্দেহ নেই; কিন্তু তার রথচক্রতলে পিষ্ট মানবাত্মার আর্তধ্বনি গগনতলে উচ্ছ্বসিত হয়ে সেই উদ্ধত রথচূড়াকে অতিক্রম করে যায়। মানবজীবনের এই পরিচয়কে আশ্রয় করে ঐতিহাসিক রসের উদ্বোধন ঘটে থাকে।

মধুসূদন নিজেও এই সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে একটিপত্রে লিখেছেন—

> "For you must remember that the play is a historical one, and to introduce bottles and political discussions. Would be to astonish the weak sense of the audience and the reader"

ঐতিহাসিক নাটক বলে তার মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের অবতারণা ঘটলে মানবজীবন ভিত্তিক রসাবেদন যে বিঘ্নিত হবে এই সম্পর্কে মধুসূদন সচেতন ছিলেন। যদিও মঞ্চের তাগিদে তিনি তাঁর এই নাটকটি রচনা করেছিলেন, তথাপি এর পেছনে শিল্পীপ্রাণের উৎকণ্ঠা থাকায় ইতিহাসের তথ্য ও মানব সত্য এই দুই ধারা মিলিত হয়ে রসের পূর্ণতা এনেছে।

ইতিহাসের তথ্যকে অস্বীকার করবার উপায় নাট্যকারের বা ঔপন্যাসিকের থাকে না। কিন্তু তিনি সেই তথ্যাদি থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন করেন এবং তাদের যথাযথ সন্নিবেশের ফলে তিনি যুগ অভিপ্রায়কে প্রকাশ করে থাকেন। ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের এইক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকলেও, সাহিত্যস্রষ্টা ব্যক্তিজীবনকে আশ্রয় করে রস পরিণামের দিকে মনোনিবেশ করে থাকেন। ইতিহাসে বর্ণিত যে কোনো

আখ্যায়িকা গ্রহণ করলে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। ইতিহাসের প্রবাহ যেখানে যুগাবসান থেকে যুগান্তরের দিকে প্রবাহিত, সেই অংশকে নির্বাচন করে তিনি যেমন তাকে চিত্তবিস্ফোরক দূরত্ব দান করেন এবং কৌতূহল ও আকর্ষণ সৃষ্টি করেন, তেমনি তার মধ্যে অবস্থিত চরিত্র সমূহের মানবরূপ প্রকাশিত করে থাকেন। এইক্ষেত্রে সাহিত্যস্রষ্টার অভ্রান্ত যুক্তিবোধ, তথ্যের প্রতি নিষ্ঠা, ইতিহাস চেতনা ও কল্পনা শক্তি একযোগে কাজ করে থাকে।

কল্পনারূপে যা আখ্যাত তা নিছক মনের খেয়ালীপনা নয়। এই সৃষ্টিকারী কল্পনাশক্তির বলে সাহিত্যস্রষ্টা বিচ্ছিন্ন ঘটনারাজির মদ্যে পারম্পর্য স্থাপন করে তাদের তাৎপর্য ও চরিত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে থাকেন। শেক্সপীয়রের মধ্যে এই অপূর্ব গুণ ছিল, কিন্তু তাঁর সমসাময়িক নাট্যকার যেন জনসন বোমের ইতিহাস অবলম্বনে রচিত Sejanus-His fall নাটকে তথ্যের প্রতি সুবিচার করলেও সেই তথ্যসমূহকে প্রাণরসে মানবিক ও জীবন্ত করে তুলতে পারেননি।

ইতিহাসে বর্ণিত চরিত্রসমূহের মধ্যে আমরা বস্তুভিত্তিক বহিরঙ্গ পরিচয় পাই। সেখানে ঘটনাসমূহ অপরিহার্য কার্যকারণের সূত্রে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের মনকে জাগিয়ে তোলে না। চরিত্রসমূহেরও উচ্চচূড় রথে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আমাদের সচকিত করে, কিন্তু অভিভূত করতে পারে না। সাহিত্যস্রষ্টা এদের প্রাণরসে সঞ্জীবিত করে তোলেন।

'নাট্যশাস্ত্র' প্রণেতা আচার্য ভরত বহুদিন আগেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন নাটক হল দৃশ্যশ্রব্য ক্রীড়নীয়ক। আধুনিক যুগে এই আঙ্গিকটির বেশ কয়েকটি বিভাগ বেড়েছে। তার মধ্যে একটি হল— ঐতিহাসিক নাটক। নামেই প্রকাশিত হচ্ছে এর একদিক ইতিহাস, অন্যদিক নাটক। ইতিহাসের উপাদানকে আশ্রয় করে নাটকটি গড়ে উঠেছে। ক্রিস বালভিকের ভাষায়—

> "History play, a play representing events drawn wholly or partly from recorded history," (Chiris Baldick : Oxford concire dictionary of Literary Terms, 1996)

বিশিষ্ট সমালোচক হাডসন বলেছেন—

> "For to be truly an historical drama a work should not adhere to the literal truth of history in such a sort as to hinder proper dramatic life, that is the law of the drama are here paramount to the facts of history." (W.H. Hudson — An Introduction to the study of Literature.)

ইতিহাসের তথ্যকে অন্ধ অনুসরণ করলে নাটক হয় না, ইতিহাস হয়। আবার প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসকে পদে পদে লঙঘন করলে ইতিহাসের সঙ্গে সংস্রব থাকে না, নাটক হয়। আসলে ঐতিহাসিক নাট্যকারের কাজ ইতিহাসের বৃন্তে মানবজীবনের ফুল ফোটানো।

তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, নাট্যকার ইতিহাসকার নন। তাঁর কাজ, ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে, ঐতিহাসিক পরিস্থিতির জীবনের যে রসরূপ নিহিত আছে, সেই রূপকেই ফুটিয়ে তোলা। সমাজজীবনের বা ব্যক্তিজীবনের ইতিহাসদ্বারা নাট্যকারের কল্পনা নিয়ন্ত্রিত একথা সত্য, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত পরিধির মধ্যে কল্পনার

স্বাধীন সাধনার অধিকার তাঁর অবশ্যই আছে। ইতিহাস নাট্যকারকে আলম্বনবিভাব (পাত্র-পাত্রী) ও উদ্দীপনাবিভাব (দেশ-কাল-পরিস্থিতি) যোগালেও নাট্যকার নাটকের আসলটুকু অর্থাৎ অনুভাবাদি নিজেই সৃষ্টি করে থাকেন। আর সেই সৃষ্টির মহিমাতেই নাট্যকারের কবিকীর্তি। তবে 'ঔচিত্য' অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি আবস্যক হয় ঐতিহাসিক নাটকের পক্ষে অত্যাবশ্যক। ঐতিহাসিক নাটকে ঔচিত্যবোধ আপত্তিজনকভাবে ক্ষুণ্ণ বলে ঐতিহাসিকত্বের ভাবশুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায় এবং তা বাস্তবিকই দোষাবহ। ঐতিহাসিক নাটকের পক্ষে অবাস্তবতা বড় দোষই বটে। এই কারণে খাঁটি ঐতিহাসিক নাটকে, ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্র কল্পনা বিষয়ে অতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার—অর্থাৎ ঘটনা বা চরিত্র এমন না হয় যাতে তাদের সত্যতা সম্বন্ধেই পদে পদে সন্দেহ জাগে। ঐতিহাসিক নাটকের পক্ষে ঔচিত্যহানি অনুপেক্ষণীয় বিচ্যুতি। বিশেষত উপস্থাপ্য যুগটি বর্তমানের যত সন্নিহিত অথবা যুগটির ইতিহাস যত সুপরিব্যক্ত উপস্থাপনা তত বাস্তবানুগ হওয়া দরকার এবং যুগ যত ব্যবহিত এবং যত অস্পষ্ট, তার উপস্থাপনায় কল্পনার অবসর তত বেশি। প্রত্যেক যুগেই এক একটা ঔচিত্যবোধের পরিমণ্ডল থাকে এবং কোন্‌টি উচিত বা কোন্‌টি অনুচিত, সেই ঔচিত্যবোধের অনুপাতেই বিচার করা হয়। এক যুগের অনুচিত, অন্য যুগের অনুচিত হতে পারে; ঐতিহাসিক নাটক রচনাকারীকে এ কথা যেমন মনে রাখতে হবে, তেমনি যে যুগের ইতিহাস বা জীবনকে তিনি রূপ দেবেন সেই বিশেষ যুগের আচার বিচার, রীতি-নীতি, বাস্তববোধ প্রভৃতিকেও অবশ্যই অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করবেন। যে নাট্যকার তাঁর রচনায় যুগের আবহাওয়াটি যত নিখুঁতভাবে ব্যক্ত করতে পারেন, ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে তার সৃষ্টির মর্যাদা তত বেশি। বলা বাহুল্য, যথাযথ ইতিহাসবৃত্তকে উক্তি-প্রত্যুক্তিবন্ধে উপস্থাপিত করাই যথেষ্ট নয়, সার্থক ঐতিহাসিক ব্যক্তির বা ঘটনার বাস্তবিক এবং সার্থক রসরূপ।

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে ঐতিহাসিক নাটকের শ্রেণীবিভাগের কথা। সি. এফ. টুকার ব্রুক, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদের ইতিহাসমূলক নাটকগুলোকে নিম্নলিখিত পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—

১। মিশ্ররসের নাটক। গঠনে অতি শিথিল।

২। চরিতমূলক নাটক, বিখ্যাত চরিত্রের ঘটনার উপস্থাপনা।

৩। ট্র্যাজিক। ঐতিহাসিক।

৪। জাতীয় ভাব প্রধান ঐতিহাসিক নাটক।

৫। ইতিহাসের রোম্যান্টিক উপস্থাপনা।

ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকারকে কতকগুলি শর্ত মেনে চলতে হয়—

১। সমসাময়িক জীবনের বিষয়বস্তু ও বাস্তব চরিত্রসমূহের পরিবর্তে নাট্যকার অতীত ইতিহাসের কোনো একটি সময় পরিধি বেছে নেবেন, যার প্রতি প্রকাশ পায় লেখকের বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও প্রেমমুগ্ধতা।

২। নাটকে বর্ণিত যুগের প্রতি তথা ঘটনার প্রতি তাঁর আস্থা থাকা চাই। সেইসময় কালের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার-সংস্কার, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সকল বিষয়ে নাট্যকারকে সচেতন থাকতে হয়। নইলে নাটকটি ঐতিহাসিক নাটকের সংজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হতে পারে।

৩। ঐতিহাসিক নাটকের নায়ক-নায়িকা তথা প্রধান কুশীলব সকলেই ইতিহাসের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তাঁরা কেউ আপন কীর্তিবলে কীর্তিমান; আবার কেউ অপকীর্তির দরুন অপযশপ্রাপ্ত, নিন্দিত। এইসব চরিত্রের রূপায়ণে নাট্যকারকে ইতিহাসের প্রতি যথাসম্ভব বিশ্বস্ত থাকতে হয়।

৪। কালানৌচিত্য দোষের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও নাট্যকার কিছু কল্পকাহিনি সৃষ্টি করতে পারবেন।

৫। ইতিহাসাশ্রিত চরিত্রগুলির ঐতিহাসিকতা যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখেও তাদের যথেষ্ট প্রাণবন্ত করে তোলা ও নাটকের জীবনভাবনা ব্যক্ত করার ক্ষমতাই ঐতিহাসিক নাট্যকারের কাছে প্রত্যাশিত।

৬। ইতিহাসের বাস্তবতা ও কল্পনার সম্ভাব্যতার মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য চাই যা কাহিনি ও চরিত্রকে বিশ্বাস্য করে তুলবে।

৭। ঐতিহাসিক নাটকের কারবার ইতিহাসের বিশাল পটভূমিতে আবর্তিত জীবনের উত্থান-পতন নিয়ে। ইতিহাসের সামাজিক-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আবেগ-আলোড়ন এই জাতীয় নাটকের কুশীলবদের দেয় বিস্তৃতি, কখনো বা অতিমানবিক উচ্চতা।

৮। ঐতিহাসিক নাটকের চরিত্রগুলি নিছক ব্যক্তিপরিচয়ের পোশাক খুলে ফেলে মহাকালের অঙ্গীভূত হয়ে যায়; একটি বিশেষ স্থান ও কালের সীমা অতিক্রম করে নাটক পায় বিশ্বজনীন ব্যঞ্জনা।

৯। ইতিহাসের দাবি ও নাট্যকারের দাবি—দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য যত্নবান হতে হবে, যাতে ঐতিহাসিক পরিবেশটি সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হবে আবার নাট্যকারের জীবনবোধও প্রকাশিত হবে।

৩০১.২.৫.৪ : ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে লেখা কিছু গ্রন্থ

"যে পথ দিয়া উহার অশ্বারোহী পুরুষটি অশ্বচালনা করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতপক্ষে রোমান্সের রাজপথ; এবং বঙ্গ উপন্যাসে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই এই রাজপথের রেখাপাত করিয়াছিলেন।" —শ্রীকুমারবাবুর উক্তি যে সম্পূর্ণ সত্য তার প্রমাণ আমরা পাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভেতর দিয়ে। যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা ভাষায় উপন্যাস রচনার সূত্রপাত হয়। হ্যানা ক্যাথারিন, মুলেন্স, ভূদেব মুখোপাধ্যায় কিংবা প্যারীচাঁদ মিত্রের কথা স্মরণ রেখেও একথা বলা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই বাংলা উপন্যাস প্রথম সার্থক রূপ লাভ করেছিল। বঙ্কিমের হাতেই প্রথম বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্ম হয়।

বলাবাহুল্য যে, ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭)-এ ইতিহাস নিয়ে লেখা উপন্যাসের স্বাদ পাওয়া যায়। এছাড়া বাংলা গদ্য সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলী' (১৮০৮), উইলিয়াম কেরীর 'ইতিহাসমালা' (১৮১২), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম' (১৮০৫) প্রভৃতি গ্রন্থে ইতিহাসের আনাগোনা লক্ষ করা যায়।

বঙ্কিমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখলেন 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' (১৮৭৮), 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' (১৮৭৯)—দুটিই ঐতিহাসিক উপন্যাস। প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়', স্বর্ণকুমারী দেবীর 'মিবার রাজ' (১৮৭৭) এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনা করেন। এ ছাড়াও ইতিহাস নিয়ে বহুলেখকই বহু উপন্যাস, গল্প, কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন।

৩০১.২.৫.৫ : কৃষ্ণকুমারী নাটকের কাহিনী ও মধুসূদন

মধুসূদন রামনারায়ণ বসুকে একটি পত্রে বলেছিলেন যে, টডের ইতিহাসে প্রথম খণ্ডের ৪৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত কাহিনি তিনি নাটকে গ্রহণ করেছেন। ১৮৬০ সালে পুনর্মুদ্রিত টডের প্রথম খণ্ডে এই কাহিনি ৩৬৫-৩৬৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

রানা ভীমসিংহ ১৭৭৮-১৮২৮ সাল পর্যন্ত মেবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্রাটরূপে তাঁকে যেমন ভাগ্যের বিপর্যয় বহন করতে হয়েছে, তেমনি পিতা হিসেবেও তাঁকে চরম দুঃখ পেতে হয়েছে। একদিকে জয়পুররাজ অন্যদিকে মারবার রাজ কৃষ্ণকুমারীকে বিয়ে করতে চেয়েছে। মেবারের সঙ্কটকে আরো ঘনীভূত করে দিয়েছে মহারাষ্ট্রীয়দের বারংবার আক্রমণ। রাজকুমারী কৃষ্ণাকে নিয়ে যে বিরোধ, পরিণামে তা হেলেনকে নিয়ে গ্রিস-ট্রয়ের বিরোধের মত কৃষ্ণার জীবন ও দুই রাজশক্তিকে ধ্বংস করল।

সিন্ধিয়ার অর্থনৈতিক দাবি জয়পুর গ্রহণ না করায় তিনি রাজা মানসিংহের পক্ষ অবলম্বন করলেন। তিনি মেবারের রানাকে জয়পুরের প্রতিনিধিকে বিদায় দিতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তার দাবি অগ্রাহ্য হওয়ায় তিনি জয়পুরের সৈন্যদলসহ নিজের সৈন্যদল ও কামান নিয়ে আরাবল্লীতে গিরিআবর্ত পথে ঢুকে মেবারের বাইরে শিবির স্থাপন করলেন। রানার আর জয়পুর প্রতিনিধিকে বিদায় না দেবার কোনো উপায় রইল না। রানার সঙ্গে সিন্ধিয়ারাজের একলিঙ্গদেবের মন্দিরে দেখা হল।

বিয়েতে বাধা পাওয়ায় ও শুভকাজে অসমাপ্তি ঘটায় জয়পুররাজের সঙ্গে মানসিংহের যুদ্ধ বাঁধল। যুদ্ধে রাজা মানসিংহ পরাভূত হলেন এবং জয়পুররাজ তার রাজধানী দখল করলেন। শেষে মারবারের সর্দারগণ রাঠোর বংশের অসম্মানে আহত হয়ে জয়পুর বাহিনী পরাজিত করেন এবং জয়পুর রাজ জগৎসিংহ অসম্মানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন।

পাঠান সর্দারের নির্দেশে রানা ভীম সিংহের সামনে কোনো পথ দেখতে না পেয়ে কন্যা কৃষ্ণকুমারীকে হত্যার নির্দেশ দেন। বিনা অপরাধে নিষ্পাপ কুমারীর প্রাণবিসর্জন গ্রিকরাজ আগামেমনন দুহিতা ইফিগেনিয়ার কাহিনি স্মরণ করিয়ে দেয়। তিন-তিনবারের চেষ্টার ফলে শেষে 'কুসুমরস মিশ্রিত অহিফেন'-এ কৃষ্ণার মৃত্যু হয়। টড লিখেছেন—

"She slept! a sleep from which she never awoke."

কৃষ্ণার মা খাদ্যত্যাগ করলেন, শোকে অভিমানে তার মৃত্যু হল। অজিত সিংহের কাছ থেকে এই সংবাদ শুনে নিষ্ঠুর পাঠানসর্দারও তাকে লাঞ্ছিত করল।

মধুসূদন ইতিহাসে বর্ণিত ঘটনাসমূহকে পরিবর্তন করেননি, বা বিকৃতও করেননি। উদয়পুরের দুরবস্থা যা ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে তা মধুসূদনও একইরকমভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন—রানা ভীমসিংহ মন্ত্রীকে বলেছেন—

> "দেখ আমার ধনাগার অর্থশূন্য; সৈন্য বীর শূন্য সুতরাং আমি অভিমন্যুর মতন এ সপ্তরথীর মধ্যে নিরস্ত্র হয়েছি।"

কৃষ্ণার বিয়ে উপলক্ষ্য করে জয়পুর ও মারবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব, মহারাষ্ট্রীয় দল কর্তৃক দেশে বিপর্যয় সৃষ্টির সম্ভাবনা, জয়পুরের রাজদূতকে বিদায় দেওয়ায় জয়পুর রাজের ক্রোধ, মানসিংহের বিরুদ্ধে ধনকুল সিংহকে সমর্থন ও উভয় দলের সম্মিলিত সৈন্যদলসহ উদয়পুর আক্রমণের আয়োজন, মানসিংহের পক্ষে যবনপতি আমীর খাঁ ও মহারাষ্ট্রপতি মাধবজীর যোগদান ইতিহাস বর্ণিত এই তথ্যসমূহ মধুসূদন তাঁর নাটকে যথাযথভাবে গ্রহণ করেছেন।

বলাবাহুল্য যে, 'কৃষ্ণকুমারী' রচনাকালের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ'-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। তাই কবিসুলভ আচরণ বা ভাব পরিমণ্ডলে তিনি ছিলেন। দুটি গ্রন্থের মধ্যেই তার জীবন জিজ্ঞাসার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র পৌরুষদীপ্ত রাবণ তথা ইন্দ্রজিৎ চরিত্রের পরাভব কবির মনকে অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু রামায়ণের করুণ রসের তুলনায় হোমারের বীররসকে অনেকটা প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সঙ্গে তিনি মানব জীবনকে প্রত্যক্ষ ট্র্যাজিকরস যা মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' ও শেক্সপীয়রের নাটকগুলি পাঠ করে পেয়েছিলেন তার উপর ভর করেই নাটক রচনায় উৎসাহী হয়েছিলেন।

রাবণের হাহাকারের মধ্যে যেমন মেঘনাদবধ কাব্যের শেষ হয়েছে, তেমনি রানাভীমসিংহের শোকাবেগ, আত্মবিস্মৃতি ও উন্মত্ততা তথা বলেন্দ্র সিংহের বিলাপের মধ্য দিয়ে নাটকের শেষ হয়েছে। আগেই বলেছি যে, একই পরিবেশের মধ্যে থেকে মধুসূদন মহাকাব্য ও নাটক রচনা করেছেন। ফলে লঙ্কার মর্মন্তুদ চিত্র আমরা যেমন প্রত্যক্ষ করি, তেমনি উদয়পুরের নগ্নরূপটিও আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়।

একটা জাতির যে পতনোন্মুখ চেহারা মধুসূদনকে ব্যথিত করেছিল তাই একদিকে 'মেঘনাদ বধ কাব্যে' অন্যদিকে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ফুটে উঠেছে।

নাটকের প্রয়োজনে মধুসূদন কিছু কাল্পনিক চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন বা কিছু ঐতিহাসিক চরিত্রকে নিজের কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তুলেছেন। এক্ষেত্রে বলা যায় না তিনি মূল কাহিনি থেকে সরে এসেছেন। টডের ইতিহাসে জগৎসিংহের রক্ষিতার নাম কর্পূরমঞ্জরী। মধুসূদন তাঁর নাম শুধু পরিবর্তন করেননি, তার মধ্যে নিজের অধিকার রক্ষার প্রয়াসে ঈর্ষার প্রাবল্য দেখিয়ে কৃষ্ণার নিষ্পাপ চরিত্রের সঙ্গে বৈপরীত্য প্রদর্শন করেছেন।

ধনদাস ও মদনিকার কাহিনি তিনি নাটকের প্রয়োজনে তথা দর্শককে 'Dramatic relief' দেবার জন্য এনেছেন। ট্র্যাজেডি ও কমেডি দুটি ধারার মিশ্রণ তাঁর নাটকে দেখা যায়। আসলে নাট্যকার মধুসূদন মূল কাহিনি থেকে সরে না গিয়ে 'ইতিহাসের সত্য' ও 'মানব সত্য'-এর মধ্যে মিলন ঘটিয়েছেন। যেমনটি করেছিলেন ঔপন্যাসিক বঙ্কিম তাঁর (মধুসূদনের) নাটক রচনার প্রায় তিন দশক পরে 'রাজসিংহ' উপন্যাসে।

৩০১.২.৫.৬ : কৃষ্ণকুমারী নাটকের গঠনকৌশল

'কৃষ্ণকুমারী'র গঠনকৌশল আলোচনার আগে আমরা বুঝে নেব নাটকের নির্মাণ বা গঠন বলতে কি বোঝায়। নাটকের গঠন প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল ছটি অঙ্গের কথা বলেছেন। এই ছটি অঙ্গ বিশেষত ট্র্যাজেডির জন্য অ্যারিস্টটল বলেছিলেন। কিন্তু শুধু ট্র্যাজেডি নয়, যে কোনো নাটকের পক্ষেই প্রাথমিকভাবে দরকার এই ছটি অঙ্গের। সেগুলি হল—১। কাহিনিবৃত্ত ২। চরিত্র ৩। অভিপ্রায় ৪। সংলাপ ৫। দৃশ্য এবং ৬। সংগীত। অ্যারিস্টটলের উক্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শিশির কুমার দাশ এদের অন্তরঙ্গ আর বহিরঙ্গ এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন—

> "ট্র্যাজেডির তিনটি বহিবঙ্গ ঃ ভাষা, সংগীত ও দৃশ্য; তিনটি অন্তরঙ্গ কাহিনি, চরিত্র ও অভিপ্রায়। এদের মধ্যে সংগীত ও ভাষা হল অনুকরণের মাধ্যম, দৃশ্য হল পদ্ধতি, আর কাহিনি চরিত্র ও অভিপ্রায় হল বিষয়।" (কাব্যতত্ত্ব ঃ অ্যারিস্টটল)।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ক্ষেত্রে দেখা যায় মধুসূদন শেক্সপীয়রের রীতি অনুযায়ী নাটকটিকে পাঁচটি অঙ্কে ভাগ করেছেন। প্রথম অঙ্কে—দুটি, দ্বিতীয় অঙ্কে—তিনটি, তৃতীয়াঙ্কে—তিনটি, চতুর্থাঙ্কে—তিনটি, পঞ্চমাঙ্কে তিনটি, মোট ১৪টি গর্ভাঙ্কে নাটকটিকে বিভক্ত করেছেন।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকটির প্লট বা কাহিনি অতীতের কাহিনি। একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমিতে তৈরি হচ্ছে এ নাটকের সংকট, সেই পরিপ্রেক্ষিতটির বিষয়ে পাঠক বা দর্শকের স্পষ্ট ধারণা তৈরি না হলে নাটক তার তাৎপর্য হারাতে বাধ্য।

নাটকটির শুরু হয়েছে এক 'suspense'-এর মধ্যে দিয়ে। জয়পুরের রাজগৃহে। প্রথম থেকেই নাটকটিকে কে বিষাদময় পরিণতিতে পৌঁছে দেবার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে যায় জয়পুরের দূত ধনদাসের সাহায্যে। তারপর আস্তে আস্তে নানা দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরের পৌঁছে নাটকটি করুণ পরিণতিতে পৌঁছায়।

মধুসূদন গর্ভাঙ্কের বৈচিত্র্য পছন্দ করতেন। আবার স্থান ও কালের ঐক্য সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

> "Yet I like to preserve unity of place and as for as I can, that of Time also."

এই নাটকে পাঁচটি অঙ্কে ১৪টি গর্ভাঙ্ক দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম অঙ্কের স্থান জয়পুর, দ্বিতীয়াঙ্কের—তৃতীয়াঙ্কের—উদয়পুর, চতুর্থাঙ্কের—জয়পুর, পঞ্চমাঙ্কের স্থান—উদয়পুর। তা হলে নাটকটিতে স্থান-কালের খুব বেশি হেরফের নাট্যকার করেননি।

নাটকে পুরুষ চরিত্রের সংখ্যা ছয়—ভৃত্য, রক্ষক, দূত, সন্ন্যাসী বাদ দিয়ে। স্ত্রী চরিত্রের সংখ্যা পাঁচ। স্থান এবং কালগত পটভূমি বিস্তৃত নয়, চরিত্র সংখ্যা কম। মোটের ওপর একটিই ঘটনা অবলম্বন করে নাটকীয়দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। আবার শেক্সপীয়রীয় রীতিতে দৃশ্য পরিকল্পনা ও মঞ্চভাবনা দেখা যায়, যা নাটকের গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদান। Plot বা কাহিনি বৃত্তের পাশাপাশি আমরা sub-plot বা উপকাহিনিও এই নাটকে দেখতে পাই। বিলাসমতী-মদনিকা-ধনদাসের উপাখ্যান যা কিনা মূল কাহিনির সঙ্গে সম্পৃক্ত। মূলত বিশেষ কোনো তাৎপর্য বা কাহিনিকে জটিল এবং আরো বেশি নাটকীয় করে তুলতে মধুসূদন এই উপকাহিনির অবতারণা করেছেন।

প্রাচীন গ্রীক নাটকের কিছু কিছু উপাদান ব্যবহার করলেও নাট্য নির্মাণের ক্ষেত্রে মধুসূদন শেক্সপীয়রকেই অনুসরণ করেছিলেন।

নাটকের গঠন সংলাপ বিশেষ ভূমিকা পালন করে, মূলত সেই সময় মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ ঘটান তাঁর কাব্য-কবিতায়। আর তাঁর আগে তেমনভাবে কোনো নাট্যকারই সংলাপে কোনো আদর্শ ঠিক করতে পারেননি। তবে 'কৃষ্ণকুমারী' লেখার আগে দুটি ব্যঙ্গ নাটক লিখে সংলাপের ক্ষেত্রে খানিকটা স্থিতিস্থাপকতা আনতে পেরেছিলেন। দীনবন্ধু মিত্রের মত সাধুভাষা সম্বলিত আড়ষ্ট গদ্য প্রয়োগ তিনি করেননি। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মুখে তিনি তাদের উপযুক্ত ভাষা প্রয়োগ করেছেন।

নাটকের গানগুলি নাটকটি গঠনে সাহায্য করেছে। মোট পাঁচটি গান আছে নাটকে। গানগুলি খুবই প্রথাগতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং গানগুলি গাওয়া হয়েছে নেপথ্যে থেকে, যা নাটকের গতির পক্ষে সহায়ক মনে হয় না। তবে নাট্য গঠনের সহায়ক অঙ্গ হিসেবে গানগুলির মূল অপরিসীম।

যাইহোক, শেষে বলা যায় যে, নাট্যকার মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারীর গঠনকৌশলের ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও প্রথম ইউরোপীয় ধাঁচের নাটক রচনাতে তিনি সফল।

৩০১.২.৫.৭ : ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে 'কৃষ্ণকুমারী'র সার্থকতা

বাংলা নাটকের গতিহীন যুগে মধুসূদনের আবির্ভাব। সমকালীন কোনো নাট্যকারই সংস্কৃত নাটকের বাতাবরণের বাইরে এসে দাঁড়াতে পারেননি। অনুবাদাশ্রয়ী শ্লথ গতিসম্পন্ন নাটক দর্শক মনকে তৃপ্ত করতে পারছিল না। নাটকে নাট্যরস সৃষ্টির প্রয়াস তাঁদের মধ্যে তেমন ছিল না। এমতাবস্থায় মধুসূদন নাটক রচনা শুরু করেছিলেন সমকালীন নাট্যমঞ্চের 'অলীক কুনাট্য' লক্ষ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রেনেসাঁসের জাগরণ ঘটে বাংলা সাহিত্য জগতে। আর রেনেসাঁসের সঙ্গে আসে ঐতিহ্য চেতনা, অতীত জিজ্ঞাসা। মধুসূদন এই প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে টডের 'Annals and Antiquitees of Rajasthan' থেকে উপাদান সংগ্রহ করে লেখেন— 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক। এ প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেন বলেছেন—

> "ইতিহাস হইতে আখ্যান বস্তু গ্রহণ করিয়া লেখা বাংলা নাট্যরচনার মধ্যে কৃষ্ণকুমারী নাটক প্রথম।"
>
> (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ ২য় খণ্ড)

আমাদের আলোচ্য 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ঐতিহাসিকতা বিচারের পূর্বে ঐতিহাসিক নাটকের সংজ্ঞা স্বরূপ সম্পর্কে দু-চার কথা বলে নেব।

যে নাটকের মূল কাহিনি, প্রধান প্রধান ঘটনা ও চরিত্রগুলি ইতিহাস থেকে গৃহীত এবং নাট্যকারের সৃজনশীল পরিকল্পনা সহযোগে বা মানবিক গুণে মণ্ডিত হয়ে শিল্পমূল্য রসোত্তীর্ণ হয় তাকেই আমরা ঐতিহাসিক নাটক বলি। ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে আগে আলোচনা হয়েছে, সেজন্য ঐতিহাসিক নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে আলোচনা করব না। শুধুমাত্র আমরা নাটকটিতে কতখানি ইতিহাস রেখাপাত করেছে তা আলোচনা করব।

নাট্যকার মধুসূদনকে অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রাজপুত জীবনের ইতিহাস নিয়ে নাটক লিখতে অনুরোধ করেছিলেন। মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক লিখে রাজনারায়ণ বসুতে চিঠিতে লেখেন—

> "The plot is taken from Tod, Vol-I page-461, I suppose you are well acquainted with the story of the unhappy princess Kissen Kumari."

সুতরাং তিনি যে, 'টডের রাজস্থান' গ্রন্থ থেকেই তাঁর নাট্যকাহিনি নির্বাচন করেছিলেন একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কিন্তু এই ঐতিহাসিক অনুশীলন কতদূর সার্থক হয়েছে তা বিচার্য। যেখানে ইতিহাসের বিচ্যুতি তা নাটকের প্রয়োজনে ঘটেছে তবে তিনি কোনো ঘটনাকে বিকৃত বা পরিবর্তিত করেননি।

টডের বিবরণ থেকে জানা যায় ১৭৭৮-১৮২৮ সাল পর্যন্ত রানা ভীমসিংহ মেবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে সবদিকে দিয়েই মেবারের ইতিহাস দুর্ভাগ্যজনক। চন্দ্রাবৎ ও মঞ্চাবৎদের দ্বন্দ্বে মেবারের রণশক্তি ঐক্য ও মাহাত্ম্য হারিয়েছিলেন। নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব মেটাবার জন্য রানা মহারাষ্ট্রীয়দের আহ্বান জানালেন। অতি সহজেই উদয়পুরে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল; তাদের দাবির টাকা মেটাতে গিয়ে রাজার রাজকোষ শূন্য হল। সামন্তদের উপরে অন্যায় অর্থনৈতিক শোষণ চলতে লাগলো, এই ঐতিহাসিক দুরবস্থার পটভূমিতে কৃষ্ণকুমারীর বেদনাদায়ক পরিণতির ঘটনাটি অনুষ্ঠিত হয়। জয়পুর রাজের সঙ্গে তাঁর বিবাহের সম্বন্ধ স্থিরিকৃত হয়েছিল এবং সেই শুভ সম্বন্ধকে দৃঢ় করবার জন্য জয়পুর থেকে সেনাদল উদয়পুরে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু মারবাররাজ মানসিংহ কর্তৃক সে বিষয়ে ঘোরতর প্রতিবাদ এল। তারই আন্তরিক অভিলাষ যে তিনি কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহ করেন। ফলে একটি ভয়াবহ যুদ্ধের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অন্যান্য মারাঠা দস্যুরা দুপক্ষে যোগ দিল। এতে ভীমসিংহ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন এবং কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠল। পিতার আদেশে তিন-তিনবারের চেষ্টায় মৃত্যুলাভ করল। এছাড়া জয়পুর রাজ্যের রক্ষিতা কর্পূরমঞ্জরীর ভূমিকাও এই বিরোধের মূলে সর্বাপেক্ষা বেশি ইন্ধন জুগিয়েছিল। বলেন্দ্র সিংহ প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্রের উপস্থিতি নাটকটিকে ঐতিহাসিক নাটকের গৌরব এনে দিয়েছে। অর্থাৎ যে কাহিনি 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ভিত্তি সেই টডের বর্ণনা অংশে কোনো অনৈতিহাসিকতা নেই।

পঞ্চমাঙ্ক সমন্বিত এই নাটকে সর্বত্রই ইতিহাসের যোগসূত্রতা লক্ষ করা যায়। যদিও এই নাটকে কিছু কল্পিত চরিত্র রয়েছে কিন্তু তারাও নাটকের ঐতিহাসিক রসসৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। নাটকের প্রাণশক্তি যে, দ্বন্দ্বময়তা তাকে এখানে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণের আশায় বিভিন্ন রাজাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং পরিণতিতে কৃষ্ণকুমারীর করুণ আত্মহনন এই নাটকের প্রধান উপজীব্য।

নাটকে কিছু বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়। নাট্যকার কিছু কল্পিত চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন ঘটনাগত অসঙ্গতি দূর করবার জন্য বা ঘটনার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি করার জন্য। যেমন—মানসিংহ এবং জগৎসিংহের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইতিহাস সমর্থন করলেও তাদের মধ্যে শত্রুতার কোনো উপলক্ষ্য ইতিহাস আমাদের দেয়নি। আবার তিনি মদনিকা ও ধনদাস নামে দুটি কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন এই দ্বন্দ্ব ঘনীভূত করবার জন্য। কৃষ্ণকুমারী সম্পর্কে অজ্ঞ জগৎসিংহকে তার পাণিপ্রার্থী করে তোলবার কৃতিত্ব যেমন ধনদাসের তেমনি সুকৌশলে অন্য এক রাজপুত রাজা মানসিংহকে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টেনে এনেছে মদনিকা। এদের সৃষ্টি করে

মধুসূদন নাট্যপ্রবাহে জটিলতা ও লঘু হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। ফলে তারা আকর্ষণীয় চরিত্র হলেও নাটকের শিল্পমূল্য কিছুটা ব্যাহত করেছে।

শেষে বলা যায়, নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মধুসূদন টডের ইতিহাস থেকে মেবারের এমন এক সঙ্কটপূর্ণ অধ্যায় নির্বাচন করেছেন যা তার চরম দুর্ভাগ্যের কাহিনি ব্যক্ত করেছে। এর মধ্যেও নাটকটিতে তিনি ইতিহাসকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। পাশাপাশি নিজের কল্পনাকেও প্রাধান্য দিয়েছেন, এবং ঐতিহাসিক নাটক বলতে আমরা যা বুঝি নাটকটিতে তার সবগুণই বর্তমান। এছাড়াও মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'র আদর্শে অনেক নাট্যকর ঐতিহাসিক নাটক রচনাতে উৎসাহ দেখিয়েছেন।

৩০১.২.৫.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। নাট্যকার মধুসূদন দত্তের নাট্যবৈশিষ্ট্য আলোচনা করে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের গোত্র নির্ণয় করো।

২। ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে কৃষ্ণকুমারীর যৌক্তিকতা বিচার করো।

৩। কৃষ্ণকুমারী নাটকে মধুসূদন মূল কাহিনীকে কতখানি অনুসরণ করেছেন আলোচনা করো।

৪। ঐতিহাসিক নাটকের সংজ্ঞা স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখাও কৃষ্ণকুমারীতে কতখানি 'ইতিহাস' ও 'কল্পনার' মেলবন্ধন ঘটেছে।

৫। কাহিনী, চরিত্র, পরিণতি—এই তিন দিক থেকে আলোচনা করে 'কৃষ্ণকুমারী' যথার্থ ঐতিহাসিক নাটক কি না জানাও।

————

একক - ৬

ট্রাজেডি বিচার

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.২.৬.১ : ট্র্যাজেডি বিচার

৩০১.২.৬.২ : সংলাপ

৩০১.২.৬.৩ : নামকরণ

৩০১.২.৬.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০১.২.৬.১ : ট্র্যাজেডি বিচার

ট্র্যাজেডি সম্পর্কে সমালোচকরা বলেন—

> "It is a story of exception calamity of man in high stage leading to his death arising pity and fear."

অর্থাৎ কোনো সম্ভাবনাপূর্ণ চরিত্রের সাধারণ বিপর্যয়জনিত পতন বা করুণ পরিণতি হলে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি হয় যা দর্শক ও পাঠকচিত্তে ভীতি ও করুণার সঞ্চার ঘটিয়ে থাকে। এই জাতীয় বিয়োগান্ত নাটকের পরিণাম গ্রিক ট্র্যাজেডি অনুযায়ী বহিরঙ্গ প্রভাবেও হতে পারে যেখানে মূলত faith বা নিয়তিবাদ ট্র্যাজেডির অন্যতম কারণ। অন্যদিকে শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি ও চরিত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা বা ত্রুটি ট্র্যাজেডির মূল কারণ। তাই শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির এমন একজন—Who has done and suffer something terrible.

উপরোক্ত এই আলোচনার ভিত্তিতে আমরা যদি 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকটির মধ্যে প্রবেশ করি তাহলে দেখতে পাব উদয়পুরের রাজকুমারী কৃষ্ণার সৌন্দর্য, যৌবনের উচ্ছলতা কিভাবে তাকে চরম বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। সুন্দরী কৃষ্ণকুমারী একই সঙ্গে একদিকে জগৎসিংহ, অন্যদিকে মানসিংহ উভয়ের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে তার জীবনের সবথেকে ব্যথাবহ ঘটনা হল এই যে তিনি পিতার দিকে তাকিয়ে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে দুজনের মধ্যে থেকে যে কোনো একজনকে জীবনসাথী বানানোর দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারেননি। এখানেই তার চরম ট্র্যাজিক পরিণতি। নিষ্পাপ কৃষ্ণকুমারী নিয়তির তপ্তস্পর্শে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভীমসিংহের নির্দেশে মনের কামনা বাসনা সমস্ত কিছুকে নিবারিত করে এক মর্মান্তিক পরিণতির শিকার হয়েছে। শুধু তাই নয়, নাটকের শেষদৃশ্যে কাকা বলেন্দ্র সিংহের কাছ থেকে যখন কৃষ্ণকুমারী জানতে পেরেছে যে তার পিতাই তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছে, তখন তার সেই আর্তি

> "কাকা আমার পিতার ও কি এই ইচ্ছা।"

এই উক্তি দর্শক চিত্তকে নাড়া দিয়েছে এবং সাথে সাথে তার আত্মহত্যা ট্র্যাজেডির পথ রচনা করেছে।

অন্যদিকে ভীমসিংহের অক্ষমতায় সৃষ্ট এক জটিল পরিস্থিতিতে কৃষ্ণার আত্মহত্যা। ফলস্বরূপ মহিষী অহল্যার মৃত্যু, পিতা ভীমসিংহকে কম দগ্ধ করেনি। এই চরম পরিস্থিতিতে ভীমসিংহের শোকোন্মত্ততা যে গভীর কারুণ্য সৃষ্টি করেছিল তার আবেদন সমগ্র রাজপরিবার থেকে বিস্তৃত রাজ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে এবং দেশ ও জাতির জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি কৃষ্ণকুমারী নাটকে ট্র্যাজেডির বীজ নিহিত আছে। একদিকে কৃষ্ণকুমারী অন্যদিকে ভীমসিংহ এই দুজনের দ্বারা সৃষ্ট নাটকের জটিল আবর্ত এক অনিবার্য দুঃখ পরিণতির দিকে অলঙ্ঘ আকর্ষণে নাটকটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু তথাপি সমালোচকদের মতানুযায়ী 'কৃষ্ণকুমারী' সার্থক ট্র্যাজেডি হয়ে উঠতে পারেনি। তার কারণ—

প্রথমতঃ নাট্যসাহিত্যের অদ্বিতীয় সমালোচক নিকল তাঁর 'Theory of Drama' গ্রন্থে একটি চমৎকার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন পুরুষ চরিত্রই সবসময় ট্র্যাজেডির নায়ক হয়ে থাকে। তাঁর মতে কোমলভাবাপন্ন দুর্বলচিত্ত নারী ট্র্যাজেডির মধ্যে অপ্রধান ও প্রভাবহীন।

দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণার মৃত্যু ট্র্যাজেডির রীতি অনুযায়ী দর্শক মনে 'pitty'-র সৃষ্টি করলেও 'fear' অর্থাৎ ভয়ের সৃষ্টি করেনি। কেননা চরিত্রটির আত্মরক্ষার কোনো প্রয়াস ছিল না। এমনকি 'Doing and suffering'-ট্র্যাজেডির এই অনিবার্য বৈশিষ্ট্যও কৃষ্ণার চরিত্রে নেই।

তৃতীয়তঃ কন্যার মৃত্যুতে অহল্যা বাঈ-এর শোকগ্রস্ত মৃত্যু ট্র্যাজেডির পরিবেশকে লঘু করে দিয়েছে।

চতুর্থতঃ একদিকে কৃষ্ণার মৃত্যু অন্যদিকে স্ত্রী অহল্যার মৃত্যু ভীম সিংহকে ট্র্যাজিক চরিত্রের এক বিশাল আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দাবি জানায় কিন্তু সে ক্ষেত্রেও দেখা যায় ট্র্যাজেডির নায়ক হিসেবে যে কর্মকুশলতা তার মধ্যে থাকা উচিত ছিল তা অনুপস্থিত।

পঞ্চমতঃ নাটকের প্লট বিন্যাসের ক্ষেত্রেও মধুসূদন নাটকটিকে দ্বন্দ্বমুখী করার যে সুযোগ ছিল সেদিকে নজর দেননি। ঘনঘন নাটকীয়তা সৃষ্টির পরিবর্তে অলৌকিক স্বপ্ন দৃশ্য যোজনা নাট্যপ্লটে অন্তত ট্র্যাজেডির রসসৃজনে বন্ধাত্ব সৃষ্টি করেছে।

ষষ্ঠতঃ সর্বোপরি ট্র্যাজেডিধর্মী নাটকে দর্শকচিত্তকে Relief দেওয়ার জন্য যেভাবে কমেডির অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়, মধুসূদন সেখানেও ব্যর্থ।

আলোচনার উপসংহারে এসে বলা যায় যে, ট্র্যাজেডির যোগ্যনায়িকা হিসাবে গড়ে তোলার জন্য টডের ইতিহাস থেকে সবে এসে নাট্যকার মধুসূদন কৃষ্ণার আত্মহত্যা ঘটালেও চরিত্রটির আত্মসমর্পণ ট্র্যাজেডির রস পূর্ণ করেছে। অন্যদিকে ভীমসিংহ চরিত্রের নিষ্ক্রিয়তা নাটকে ট্র্যাজেডির বীজকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করেছে। ফলস্বরূপ ভীম সিংহ যেমন পুরোপুরি কিংলিয়র হয়ে উঠতে পারেনি। কৃষ্ণাও তেমনি ইফিগনিয়া হয়ে উঠতে পারেনি। তবে একথাও ঠিক এই নাটকটি বাংলা সাহিত্যে মৌলিক ট্র্যাজেডি রচনার প্রথম প্রয়াস। সুতরাং অপূর্ণতা তো থাকবেই। আর তাই প্রস্তুতিপর্বে নানা অপূর্ণতা সত্ত্বেও নাটকে নানা ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে যতটুকু ট্র্যাজেডি ছিল তার সার্থক রূপদানের প্রয়াস অবশ্যই প্রশংসারযোগ্য। আর তাই উৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডি না হলেও প্রথম ট্র্যাজেডি নাটক হিসেবে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের গুরুত্ব অপরিসীম।

৩০১.২.৬.২ : সংলাপ

সংলাপ হল নাটকের প্রাণ। সংলাপের মধ্য দিয়েই নাট্যকার নাটকের বিষয় ও চরিত্রবিন্যাস করেন। সংলাপের সাহায্যে ঘটনার উপস্থাপন, অগ্রগতি সাধন এবং চরিত্রের সংহত রূপায়ণ নাটকে নাট্যকার ফুটিয়ে তোলেন। সেই কারণে অ্যারিস্টটল নাটকের পরিকাঠামো নির্মাণে সংলাপকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। নাট্যসমালোচক এ. নিকল তাঁর 'Theory of Drama' গ্রন্থে নাটকের সংলাপ সম্পর্কে বলেছেন—

> "It is through the dialogue alone as interpreted by the actors, that he can convay his story to the assembled audience."

সুতরাং নাটকের বিষয় ও চরিত্রোপযোগী সংলাপ ব্যবহৃত না হলে নাটকের অন্য অনেকগুণ থাকা সত্ত্বেও তা ব্যর্থ হয়ে যায়। আর নাটক যদি হয় জীবনধর্মী ঘটনা ও বাস্তব চরিত্রের সম্মিলন তা হলে সংলাপকেও হতে হবে জীবন্ত, স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম। ভবানী গোপাল সান্যাল যথার্থই বলেছেন—

> "নাটকের শুধু বাহন নহে, ইহার প্রাণ হইল সংলাপ। ইহার মাধ্যমে যে রূপচরিত্রের রূপ প্রকাশিত হয়, তেমনি নাটকের গতিও সঞ্চারিত হইয়া থাকে।"

নাট্যকার মধুসূদন দত্ত নাটকের সংলাপের গুরুত্ব বিষয়ে অবহিত ছিলেন। পূর্বে সংলাপের ক্ষেত্রে তিনি যে নাট্যধর্ম বজায় রাখতে পারেননি, সে সম্পর্কে তিনি কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লিখেছেন—

> "I often, forget the real in search of the poetical."

তিনি ড. জনসনের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছিলেন—

> "Style is to be probable sought in the common intercourse of life, among those who speak only to be understood, without the ambition of elegance."

পূর্ববর্তী দুটি নাটক 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী'র তুলনায় 'কৃষ্ণকুমারী'র ভাষা সরল, সংযত ও চরিত্রানুগ হয়েছে। রামনারায়ণ বা দীনবন্ধু মিত্র ভাষার এই জাতীয় প্রয়োগ ক্ষমতা দেখাতে পারেননি। মধুসূদন ভাব অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করেছেন, আবার সেই ভাষাকে বিভিন্ন চরিত্রে মানস প্রবণতার সঙ্গে সমন্বিত করেছেন। অনেকক্ষেত্রে সাধুভাষারও প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু তা উপমা সমন্বিত হলেও কৃত্রিম হয়ে ওঠেনি।

দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে রানা ভীম সিংহ ভারতভূমির হতশ্রী অবস্থা ও তার বিরূপ ভাগ্যের প্রতিকূলতার পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

> "হায়! হায়! যেমন কোনো লবনাম্বতরঙ্গ কোনো সুমিষ্ট বারি নদীতে প্রবেশ করে তার সুস্বাদ নষ্ট করে, এ দুষ্ট যবন ... সেই রূপ এ দেশের সর্বনাশ করেছে।"

কোনো কোনো স্থানে অলংকৃত ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। মানসিক আবেগের বাণীবহ হলে তখন এ ভাষাকে কৃত্রিম বলে মনে হয় না। শেক্সপীয়রও তাঁর ট্র্যাজেডির নায়কদের ক্ষেত্রে এই জাতীয় ভাষা ব্যবহার করেছেন। রানা ভীমসিংহ বলেছেন—

> "কোনো কোনো সাগরে ঝড় অনবরতই বইতে থাকে; তা এ দেশেরও কি সেই দশা ঘটল!"

তবে কাব্য সংলাপে যে অলংকৃত ভাষাকে স্বাভাবিক ও আবেগবহ বলে মনে হয়, গদ্য সংলাপে তা মন্থরতা সৃষ্টি করে অথচ গদ্যের ভাষাতেও ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা যায়। প্রতীক নাটকের ক্ষেত্রে যে সহজে এটা করা চলে তা রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। তিনি ভাষাকে করেছেন সুরাশ্রয়ী ও রূপাশ্রয়ী।

মধুসূদন তাঁর নাটকে ট্র্যাজেডির গাম্ভীর্য সৃষ্টির জন্য অলংকৃত তৎসম শব্দপূর্ণ গদ্যভাষা ও লঘুদৃশ্যে কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। কথ্যভাষার উপরে তিনি খুব প্রসন্ন ছিলেন না। প্যারিচাঁদ মিত্রের ব্যবহৃত কথ্যভাষাকে তিনি মেছুনীদের ভাষা বলে বিদ্রুপ করেছেন। কিন্তু শিল্পীরূপে এই সজীব ভাষাকে তিনি তাঁর প্রহসনদ্বয়ে ও কৃষ্ণকুমারী নাটকে স্থান দিয়েছেন।

মধুসূদনের সংলাপের বড় বৈশিষ্ট্য হল যে, তিনি চরিত্রানুগ সংলাপ ব্যবহার করেছেন। পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে জগৎসিংহ এবং ভীমসিংহ দুজনেই রাজ চরিত্র; কিন্তু একজন বিলাসী এবং সুখী, অপরজন জীবনের ভারে ক্লান্ত এবং বিষাদাচ্ছন্ন। দুটি চরিত্রের সংলাপের মধ্যে মধুসূদন আশ্চর্যজনকভাবে উভয়ের এই পার্থক্যকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। রাজকার্যে মনোনিবেশের জন্য মন্ত্রীর দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে জগৎ সিংহ বলেছেন—

> "আহার, নিদ্রা, সময় বিশেষে আরাম এ সকল না হলে আমার জীবন রক্ষা করা দুষ্কর। তা দেখ, আমার এখন কিঞ্চিৎ অলস ইচ্ছা হচ্যে। এ সকল পত্র না হয় সন্ধ্যার পর দেখা যাবে, তাতে হানি কি?"

এই সংলাপের সঙ্গে তুলনীয় মহারাষ্ট্রাধিপতির সঙ্গে সন্ধির সংবাদপ্রাপ্তির পর ভীম সিংহের উক্তিটি—

> 'হায়! হায়! আমি ভুবন বিখ্যাত শৈলরাজের বংশধর, আমাকে একজন দুষ্ট, লোভী গোপালের ভয়ে অর্থ দিয়া রাজ্য রক্ষা করতে হল? ধিক্ আমাকে! এ অপেক্ষা আমার আর কি গুরুতর অপমান হতে পারে?"

তবে বিভিন্ন জায়গায় সংলাপের দুর্বলতা লক্ষ করা যায়। এই নাট্যিক সংলাপের দুর্বলতাও 'কৃষ্ণকুমারী'কে সর্বা! সুন্দর হতে দেয়নি। সঠিক ভাষা না হলে যন্ত্রণাদগ্ধ ট্র্যাজেডিও হয় না, অর্থাৎ ট্র্যাজেডির সংলাপ রচনায় যে মাত্রাজ্ঞান শেক্সপীয়রের ছিল মধুসূদনের ছিল না, তবুও বলা যায় কোনো আদর্শকে সামনে না পেয়েও মধুসূদন সংলাপ রচনায় যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা অনস্বীকার্য।

৩০১.২.৬.৩ : নামকরণ

সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামকরণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নামকরণের মধ্য দিয়ে স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যকে ব্যঞ্জিত করেন। নামকরণ বিভিন্নভাবে হতে পারে; কখনো হয় ব্যক্তি নির্ভর বা চরিত্র নির্ভর, আবার কখনো নামকরণ হয় ব্যঞ্জনাধর্মী। আমাদের আলোচ্য বিষয় হল 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের নামকরণ কতখানি সার্থক ও অর্থবহ।

নাটকটির নামকরণ করা হয়েছে একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে। 'কৃষ্ণকুমারী' ভীম সিংহের কন্যা। নাটকটি তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। নাটকের প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত তার সক্রিয় উপস্থিতি। নাটকের প্রথমে তার শরীরী উপস্থিতি না থাকলেও ধনদাস ও জগৎ সিংহের কথোপকথন মূলত তাকে কেন্দ্র করেই। নাটকের মূল সংকটও তাকে ঘিরেই। জগৎ সিংহ ও মানসিংহ—উভয়েই তার পাণিপ্রার্থী হওয়ায় যে চরম সংকটের সৃষ্টি হয়—মূলত তাই নাটকটির মূল বিষয়বস্তু।

আবার নাটকের বিভিন্ন অঙ্কে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে কৃষ্ণার মানসিক অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। নাটকটি সমাপ্ত হয়েছে তার আত্মহুতির মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ নাটকের মূল ভাবকেন্দ্রে রয়েছে কৃষ্ণকুমারী। তাই নাটকটির নামকরণ যথাযথ ও অর্থবহ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

৩০১.২.৬.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'কৃষ্ণকুমারী'কে সার্থক ট্র্যাজেডি বলা যায় কি? উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দাও।

২। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

৩। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের সংলাপ রচনায় মধুসূদনের কৃতিত্ব বিচার করো।

৪। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে আবেগের অতিশয্য ট্রাজেডির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এই অভিমত কতদূর গ্রহণযোগ্য?

৫। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ট্রাজেডি কার—রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর না সমগ্র রাজপুত জাতির?—আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

———————

একক - ৭

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.২.৭.১ : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব

৩০১.২.৭.২ : রাজপুতদের ভগ্নদশা

৩০১.২.৭.৩ : উপকাহিনী

৩০১.২.৭.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০১.২.৭.১ : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব

মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের বিষয়বস্তু টডের রাজস্থান কাহিনির অনুরূপ। তিনি যে টডের রাজস্থানের কাহিনি অবলম্বন করেই এই নাটক রচনা করেছিলেন, সেকথা তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একটি পত্রে উল্লেখ করেছেন—

> "The plot is taken from Tod. Voll P - 461. I Suppose you are well acquainted with the story of the unhappy princess Kissen Kumari."

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে মধুসূদন পাশ্চাত্য নাট্যদর্শের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করলেও নানা অংশে বিভিন্ন সংস্কৃত নাটক ও সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই নাটকে পৌরাণিক প্রসঙ্গ ও উপমা ব্যবহৃত হয়েছে সর্বত্র। ধনদাস জগৎসিংহকে তার বংশগৌরব ও গুণের কথা স্মরণ করে দিয়ে বলেছেন—

১। "জনক রাজা কি দাশরথিকে অবহেলা করেছিলেন?"

মানসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা শুনে জগৎসিংহ বলেছেন—

২। 'দুরাত্মা রাবণ কি বৈদেহীর উপযুক্ত পাত্র?"

এইভাবে 'ইন্দ্রকুলের চূড়ামণি", 'বিধাতার লীলা', 'মদন কেতু', 'সখি', 'কৃষ্ণবিনে এ পোড়া প্রাণ আর বাঁচে না', 'সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যু' প্রভৃতি পৌরাণিক প্রস! বারবার এসেছে এই নাটকের বিভিন্ন অঙ্কে। কোথাও কোথাও সংলাপে সংস্কৃতানুসারী ভাষাভঙ্গী, উপমাদি প্রয়োগ, শব্দ ব্যবহারে তৎসমের অতি প্রবণতা বাগ্‌ভঙ্গীতে পরোক্ষ জটিলতা, মন্থরতা লক্ষ করা যায়—যা সংস্কৃত নাট্যাদর্শের কথা মনে করিয়ে দেয়। এছাড়া আগস্তের সমুদ্রপান, হিমালয় গৃহে পার্বতীর জন্ম, অর্জুন কর্তৃক মৎস্যচক্রভেদ,

কৃষ্ণকর্তৃক রুক্মিণী হরণ ইত্যাদি রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন প্রস! এসেছে বারে বারে। এছাড়া এই নাটকে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ না দেখিয়ে বিবৃতিধর্মী করে তোলায় নাট্যকাহিনি যে ধীর ও মন্থর হয়েছে তাও সংস্কৃত নাটকের প্রভাবজাত বলেই মনে হয়।

চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও এদেশীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। মধুসূদন ভবভূতি রচিত 'মালতী-মাধবী' নাটকের কপালকুণ্ডলার নামানুসারে এই নাটকের তপস্বীনির নাম দিয়েছেন কপালকুন্ডলা। এ নাটকের প্রধান নারী কৃষ্ণকুমারীর চরিত্র রচনার সময় মধুসূদনের মনের মধ্যে সংস্কৃত নাটকের মুগ্ধা নায়িকার আদর্শ জেগেছিল। দশ রূপক নামে নাট্যতত্ত্বের লেখক ধনঞ্জয় মুগ্ধা নায়িকার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

"মুগ্ধা নববয়ঃ কামা রতৌ বামা মৃদুঃ ক্রুধি।"

অর্থাৎ নব বয়ঃ প্রাপ্তা রতিবিমুখ এবং ক্রোধেও মৃদুস্বভাবা নায়িকাকে বলা হয় মুগ্ধা। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ড. সীতানাথ আচার্য এবং ড. দেবকুমার দাস জানাচ্ছেন—

— "কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিতে স্থিতা যে নায়িকার অন্তরে সদ্য কামাভাবের উন্মেষ ঘটে, রতি বিষয়ে যে বিমুখ, অভিমানবশত নায়কের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েও যে কোমলস্বভাবা, তাকে মুগ্ধা নায়িকা বলা হয়।"

মদনিকা ও বিলাসবতী চরিত্রটি শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকম্'-এর মদনিকা ও বসন্তসেনার আদর্শে চিত্রিত। 'মৃচ্ছকটিকম্'-এর মদনিকার ন্যায় এই মদনিকাও চতুরাং, দয়াবতী ও কিঞ্চিত ক্রূরস্বভাবা।

সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের ছায়া এ নাটকে ধনদাসের উপর পড়েছে বলে মনে হয়। তবে তার চরিত্রের মধ্যে যে দুষ্টবুদ্ধির অস্তিত্ব রয়েছে তার ফলে তথাকথিত বিদূষক থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে।

ভারতীয় আদর্শানুযায়ী এই নাটকের কৃষ্ণার চরিত্রের মধ্যে যে ব্যক্তি লক্ষণ ও বিশিষ্টতা ফুটে উঠেছে তা কোমল পেলবতায় একেবারে কালিদাসের শকুন্তলার মত। বৃক্ষলতাদির সঙ্গে শকুন্তলার মত কৃষ্ণার আন্তরিক সম্পর্ক।

মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের বিষয় আহরণ করেছিলেন টডের গ্রন্থ থেকে এবং টডের গ্রন্থে কাল্পনিকতা কম বেশি থাকলেও অন্তত কৃষ্ণকুমারী আখ্যানে কল্পনার সুষমা ও আদর্শবাদের আরোপ ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সময় কৃষ্ণকুমারী জীবননাট্য রাজপুতানায় অভিনীত হয়, সেই সময়ে টড রাজপুতানাতেই অবস্থান করেছেন এবং সেদিক দিয়ে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটককে বাস্তবজীবনাশ্রয়ী নাটক বললেও ভুল হবে না। সেজন্যই বোধহয় নাটকের মধ্যে জীবন সংরাগের তীব্রতা এত প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রথমেই এই নাটকে গ্রীকপ্রভাব উল্লেখ করা যেতে পারে প্রসিদ্ধ নাট্যকার ইউরিপিদিসের 'ইফিগেনিয়া ইন অলিস' নামক নাটকের সঙ্গে 'কৃষ্ণকুমারী'র কাহিনি অংশের কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। এই কাহিনির সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর সাদৃশ্য অন্তত দুটি বিষয়ে—১। ইফিগেনিয়ার মত কৃষ্ণাও পিতার আদেশে নিহত হয়, ২। উভয়ের মৃত্যুর জন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দায়ী। তবে মিলের চেয়ে অমিলের দিকটিও কম নয়, যেমন—ট্রয় যুদ্ধজয়ের সহেগ ইফিগেনিয়ার কোনো দিক থেকে কিছুই যোগ ছিল না। তার হত্যাসাধনের পেছনে ছিল—দৈবাচার্যের

ভবিষ্যৎবাণী ও যুদ্ধজয়ের জন্য দেবতাকে তুষ্ট করবার চেষ্টা, অপরপক্ষে দুর্বল মেবারের উপর যে রাজনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসছিল তা কৃষ্ণকুমারীকে কেন্দ্র করেই। অবশ্য এখানেও কৃষ্ণকুমারী কিছুমাত্র দায়ী ছিল না। এই দিক থেকে এই কাহিনীর সঙ্গে মিল আছে।

রোমান ইতিহাসের কুমারী ভার্জিনিয়া কাহিনির সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। জার্মান নাট্যকার লেসিন (LESSING)-এর ইমিলিয়া গ্যালোটি (Emilia Galotti) নাটকের সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর চরিত্রগত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। Emilia-র সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীকে Prince-চরিত্রের সঙ্গে জগৎসিংহের Marinelli-র সঙ্গে জনদাসের এবং কাউন্টেসের সঙ্গে বিলাসবতী ও মদনিকার মিল দেখে মনে হয় মধুসূদন Emilia Galotti-র অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।

তবে কৃষ্ণকুমারী নাটকে সবচেয়ে বেশি প্রভাব শেক্সপীয়রের। বিশেষ করে চরিত্র ও নাট্যধর্মের দিক থেকে তিনিই সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছেন। নারীচরিত্র সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার ব্যতিক্রম ও ইউরোপীয় মানবধর্মকে নাটকে ব্যবহার সবই এসেছে শেক্সপীয়রের নাট্যাদর্শ থেকে।

শেক্সপীয়রের সুপ্রসিদ্ধ নাটক 'The Life and Death of King John' নাটকের ফিলিপ দি ব্যাস্টার্ড চরিত্রের অনুকরণে এই নাটকের বলেন্দ্রসিংহের চরিত্রটি রচিত হয়েছে। মধুসূদন নিজেও তা এক পত্রে স্বীকার করেছেন—

> "I wish Bullender to be serious and light like 'Bastard' in king John."

ফিলিপ চরিত্রের লঘু পরিহাস প্রবণতাও তার তীক্ষ্ণ রাজনীতি ও রণনীতিবোধ, সাহস ও বীরত্ব, সহৃদয়তা মানবতা এ সবই বলেন্দ্র সিংহের মধ্যে পাওয়া যায়।

শেক্সপীয়রের ইয়াগোর সাদৃশ্যে ধনদাস চরিত্রটি রচিত হয়েছে বলে মনে হয় কিন্তু ইয়াগোর মত ধনদাস চরিত্রে জটিলতা নেই।

এছাড়া মদনিকা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, যে পুরুষোচিত গুণ তারও প্রেরণা পাশ্চাত্য নাটক থেকে এসেছে। শেক্সপীয়র রচিত 'As you like it' নাটকের স্ত্রী চরিত্র 'Gonymede' ও 'Merchant of Venice' নাটকের Portia চরিত্রের সঙ্গে এ নাটকের মদনিকা চরিত্রের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে অলৌকিকতার ব্যবহার প্রসঙ্গে কোনো কোনো সমালোচক শেক্সপীয়রের পরিকল্পিত হ্যামলেটে পিতার প্রেতদর্শন ও ম্যাকবেথে ভোজসভায় ব্যাঙ্কোর সাক্ষাৎকার দৃশ্য উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই তুলনা আরোপিত। কৃষ্ণকুমারীর স্বপ্নে পদ্মিনীর আদেশলাভ, অনেক পরিমাণেই গ্রীক নাটকের দৈবাদেশ। গ্রীক নাট্যবিশারদ গিলবার্ট মারে মন্তব্য করেছেন—

> "The heroic saga, the normal stuff of tragedy was all more or less supernatural, and the greeks accepted, and even enjoyed, the instruction of frankly supernatural beings, of oracles and hieroilogol."

কৃষ্ণকুমারী নাটকেও ('Oracles')-এর ব্যবহার লক্ষ করি।

৩০১.২.৭.২ : রাজপুতদের ভগ্নদশা

বাংলা নাটকের এক চরম সংকটময় মুহূর্তে মধুসূদনের আবির্ভাব। সমকালীন সকল নাট্যকারই তথা সংস্কৃত নাটকের নেশায় বুঁদ। তাছাড়া অনুবাদাশ্রয়ী শ্লথগতিসম্পন্ন নাটক দর্শক মনকে তৃপ্ত করতে পারছিল না। এই সময় মধুসূদন নবসৃষ্টির সাধনায় ব্রতী হলেন। প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনই প্রথম (বাংলা নাটকে) রাজস্থান গ্রন্থকে সাহিত্যসৃষ্টির উপকরণের আধার রূপে বেছে নিলেন। এরপরে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা নাটক ও উপন্যাসে রাজস্থান গ্রন্থ থেকে প্রচুর কাহিনি গৃহীত হয়েছে। রাজ-রাজার বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনি বাঙালিকে স্বদেশ প্রাণতায় দীর্ঘকাল উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী'তে যে কাহিনিটি বেছে নিলেন তা টডের মেবার কাহিনির একেবারে শেষদিকে রাজপুত জাতির ভগ্নদশার কথা। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একপত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন—

> "The plot is taken from Tod, Vol-I, P-461. I suppose you are well acquainted with the story of the unhappy princess Kissen Kumari."

রাজস্থান গ্রন্থে বহু আকর্ষণীয় ঘটনার মধ্যে মধুসূদন কৃষ্ণকুমারীর কাহিনিটি কেন বেছে নিলেন আমরা সেই আলোচনায় আসতে পারি।

মেবারের অবস্থা তখন চরমভাবে সংকটময়। সমগ্র মেবারে পতনের ছায়া নেমে এসেছে। মেবারের পূর্ব গৌরব অতীত স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েছে। রাজশক্তি ও অর্থ-সামর্থের দিক থেকে ক্রমে এতদূর অধঃপতিত হয়েছিল যে বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে বিপন্মুক্ত করতে স্বয়ং রাজাকে নিরপরাধ কন্যার মৃত্যুর ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। শক্তাবৎ-চন্দ্রাবৎদের কলহ, সেই কলহ দমনে মারাঠাদের আহ্বান। মহারাষ্ট্রীয়দের রাক্ষসী ক্ষুধায় প্রভূত অর্থ সম্পদের অঞ্জলি প্রদান—এইসব রাজনৈতিক ঘটনার জটাজালে মেবার মুমূর্ষ হয়ে পড়েছিল। যার ফলস্বরূপ অল্প কিছুকাল পরেই ইংরেজ রাজশক্তির কাছে ঘটে চরম পরাজয়।

মেবারের এই বিপন্নতার ইতিহাস মধুসূদনকে আলোড়িত করেছিল। মধুসূদন তখন 'মেঘনাদবধ' কাব্য লিখছিলেন, তাঁর সমগ্র কবি আত্মা এমনকি গোটা ব্যক্তি-অস্তিত্বও যেন ঐ মহাকাব্যের সুরে বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। স্বর্ণলঙ্কার চরম পতনের দিনগুলি ধরা পড়েছিল তার কল্পনায়, পরম গৌরবের উজ্জ্বল কাল নয়। এর মধ্যে কবির জীবন চেতনা প্রতিফলিত।

স্বর্ণলঙ্কার রাবণ ভগ্নলঙ্কার মাঝখানে বসে বেদনার্ত হয়ে উঠেছিল। শত্রুর আক্রমণে আত্মীয়স্বজনের বিনাশে, ভ্রাতার বিশ্বাসঘাতকতায় লঙ্কার গৌরব নিত্য ক্ষীয়মান। ঠিক একই সময়ে মেবারের কাহিনি থেকে নির্বাচিত কললেন এমন একটি অধ্যায় যেখানে মেবারের পূর্ব গৌরব অতীতের ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে বাস্তব শুধু ক্ষীণ শক্তি ও অর্থহীন দুরবস্থা। ভীম সিংহের কথায়—

"... আমার আর এক দণ্ডের জন্যেও প্রাণ ধারণ করতে ইচ্ছা করে না। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হায়! হায়! আমি ভুবন বিখ্যাত শৈলরাজের বংশধর, আমাকে একজন দুষ্ট, লোভী গোপালের অর্থ দিয়ে রাজ্যরক্ষা করতে হল?" ধিক আমাকে! এ অপেক্ষা আমার আর কি গুরুতর অপমান হতে পারে?" (২/১)

এ বেদনাবানী রাবণের অগ্নিগর্ভ বেদনাবাণীকে স্মরণ করিয়ে দেয়—

হায় ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে।
... ...
একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিদে, দেউটি,
... ...
তবে কেন আর আমি থাকিবে এখানে?"

—লঙ্কাপুরী বিদেশাগত রাজসৈন্যদের দ্বারা বেষ্টিত। মেবার ও মহারাষ্ট্রীয় এবং পাঠান সৈন্যদের দ্বারা উপদ্রুত, জয়পুরী এবং মারাঠা সেনাবাহিনীর সংঘাতস্থল হওয়ায় বিপর্যস্ত। মধুসূদনের যে মন মেঘনাদবধ কাব্য রচনায় মগ্ন সেই মন প্রায় সমজাতীয় কাহিনি নির্বাচনে হৃদয়ের সাড়া পেয়েছে।

মেঘনাদ বধের ট্র্যাজেডির ভিত্তি রাবণের চরিত্র তার অন্তর্বেদনা। পুত্রশোকাতুরা রাবণের বীর্যবন্ত চরিত্রের সঙ্গে ভীমসিংহের তুলনা চলে না। কিন্তু ভীমসিংহ ও প্রাণাধিক কন্যা কৃষ্ণার মৃত্যুতে বেদনাদীর্ণ। তাছাড়া সবপ্রিয় মেঘনাদের মৃত্যু যেমন মেঘনাদবধ কাব্যের বেদনাকেন্দ্র তেমনি সকলের স্নেহধন্য অতি কমনীয় প্রকৃতির কৃষ্ণার মৃত্যুকে আশ্রয় করেই এই নাটকের করুণরস তথা ট্র্যাজিক আবেদন উৎসারিত।

মেঘনাদবধ কাব্য এবং কৃষ্ণকুমারী নাটকের কাহিনি অংশ এত পৃথক অথচ এদের মধ্যে দুটি দিকে রয়েছে গুরুতর সাদৃশ্য। এই কারণেই মেঘনাদবধ রচনাকালে তিনি (রাজপুতদের ভগ্নদশা) কৃষ্ণকুমারী ছাড়া অন্য কোনো কাহিনি রাজস্থান গ্রন্থ থেকে নির্বাচন করতে চাননি।

৩০১.২.৭.৩ : উপকাহিনী

অ্যারিস্টটলের মতে কোনো কাহিনিকে নাট্যরূপ দিতে গেলে ঘটনা বা পরিস্থিতি কল্পনাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। কারণ, নাটক আসলে জীবনেরই দৃশ্যরূপের অনুকরণ। মধুসূদনও এই সত্যকে সামনে রেখে তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনা করেছেন। টড বর্ণিত কৃষ্ণকুমারীর উপাখ্যানটিকে নাট্যরূপ দেবার পূর্বে সর্বপ্রথমেই তিনি কল্পনা করেছিলেন যে, নাটকটি ট্র্যাজেডি হবে। এখন এই ট্র্যাজেডিকে তিনি কিভাবে রূপ দিতে পেরেছেন, তা-ই বিচার্য। প্রথমেই লক্ষণীয় যে, মধুসূদন এই নাটকটিকে একটি গাঢ় পিনদ্ধ ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি রূপেই অঙ্কিত করতে ইচ্ছুক ছিলেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন—

> "I have made the list of dramatist personse as short as I could, for I wish to leave no loop hole for our Manager to escape through 'Fancy' only 5 or 6 males and but 4 females in a Historic Tragedy."

কিন্তু কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুরোধ (you suggest on under plot) তিনি নাটকটিকে জটিল বৃত্ত (complex plot) নাটকরূপেই রচনা করেন। সে কারণেই নাটকের মধ্যে বিলাসবতী মদনিকা-ধনদাসের উপকাহিনিটি এসেছে। টডে যা উল্লেখমাত্র ছিল, মধুসূদন তাকেই নাটকের মূল কাহিনির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। আধিকারিক বৃত্তের (main plot) সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বৃত্তের (sub-plot) এই মেলবন্ধন নাটকটিকে গঠনের দিক থেকে 'Romantic' অভিধায় চিহ্নিত করেছে, নাট্যগঠনের এই কৌশল মধুসূদন সম্ভবত শেক্সপীয়রের নাট্যগঠনের আদর্শ থেকেই আহরণ করেছেন।

ঐতিহাসিক নাটক বা ঐতিহাসিক উপন্যাসে অনেক সময় দেখা যায়, মূল কাহিনির সমান্তরালে বিভিন্ন উপকাহিনির সমাবেশ ঘটে। এই কাহিনিগুলি মূল কাহিনিকে সমৃদ্ধ করে ও ঘটনাপ্রবাহকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে 'রাজসিংহ' উপন্যাসের কথা। এখানেও মূল কাহিনির সমান্তরাল দুটি উপকাহিনি দেখা যায়। ক. মবারক-দরিয়া-জেবউন্নিসার কাহিনি, খ. মানিকলাল নির্মলকুমারী ঔরঙ্গজেব-এর কাহিনি। বস্তুতপক্ষে ইতিহাসের প্রবল গতিবেগের মধ্যে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির বৈপরীত্যে এই উপকাহিনিগুলির মধ্যেই মানব হৃদয় ও চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

'কৃষ্ণকুমারী' নামক ঐতিহাসিক নাটকটিতেও একটি উপকাহিনি দেখা যায়। সেটি হল ধনদাস-বিলাসবতী ও মদনিকার উপকাহিনি। বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, এই উপকাহিনিটি মূল কাহিনির অগ্রসরে কতটা সহায়তা করেছে।

ধনদাস রাজসহচর, বিলাসবতী জগৎসিংহের উপপত্নী তার সখি মদনিকা। বস্তুত নাটকটির ঘটনা সংঘাত মূলত এই তিনটি চরিত্র দ্বারাই সৃষ্ট। জগৎ সিংহের মনে কৃষ্ণকুমারী সম্পর্কে আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টি করে ধনদাস। জগৎসিংহ কৃষ্ণকুমারীর প্রতি আকৃষ্ট হলে বিলাসবতী ঈর্ষান্বিত হয়। সে এই বিবাহ রদ করার উদ্দেশ্যে মানসিংহের কাছে কৃষ্ণকুমারীর নামে এক অনুরাগ পত্র পাঠায়। একাজে তাকে সহায়তা করে সখী মদনিকা। সে মানসিংহের দূতী হয়ে কৃষ্ণকুমারীকে গিয়ে জানায়, তার প্রতি মানসিংহের অনুরাগের কথা। ফলে কৃষ্ণকুমারীর মনে মানসিংহের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার ঘটে।

অর্থাৎ, দুই রাজা কৃষ্ণকুমারীকে লাভ করার আশায় যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, সেই বিরোধের বীজ বপন করে এই তিনটি চরিত্র। জগৎসিংহের নির্বোধ ও কামাশক্ত চরিত্রটিও এই চরিত্রগুলিই পরিস্ফূট করে তোলে।

অর্থাৎ, আমরা দেখলাম এই উপকাহিনিটি মূল ঘটনাপ্রবাহে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তাই উপকাহিনিটির সংযোজনায় মধুসূদন দত্ত যে সফল তা দ্বিধাতীত ভাবেই বলা যায়।

৩০১.২.৭.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। 'কৃষ্ণকুমারী'র কাহিনি নির্বাচনে রাজপুতদের ভগ্নদশাকে বেছে নেওয়া হল কেন?

৩। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে অনৈতিহাসিক দুটি চরিত্রের ভূমিকা নিরূপণ করো।

————

একক - ৮

নারী ও পুরুষ চরিত্র

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.২.৮.১ : নারী চরিত্র
৩০১.২.৮.১.১ : কৃষ্ণকুমারী
৩০১.২.৮.১.২ : বিলাসবতী
৩০১.২.৮.১.৩ : মদনিকা
৩০১.২.৮.১.৪ : অহল্যাবাঈ
৩০১.২.৮.১.৫ : তপস্বিনী
৩০১.২.৮.২ : পুরুষ চরিত্র
৩০১.২.৮.২.১ : ভীমসিংহ
৩০১.২.৮.২.২ : জগৎসিংহ
৩০১.২.৮.২.৩ : বলেন্দ্রসিংহ
৩০১.২.৮.২.৪ : ধনদাস
৩০১.২.৮.২.৫ : মন্ত্রী
৩০১.২.৮.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী
৩০১.২.৮.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০১.২.৮.১ : নারী চরিত্র

৩০১.২.৮.১.১ : কৃষ্ণকুমারী

নাটকের প্রধান চরিত্র কৃষ্ণকুমারী। উদয়পুরের রাজকুমারীর সৌন্দর্যই তাকে চরম বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। সুন্দরী কৃষ্ণকুমারী একইসঙ্গে একদিকে জগৎসিংহ অন্যদিকে মানসিংহ উভয়ের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছে। এবং এক্ষেত্রে তার জীবনের সবথেকে ব্যথাবহ ঘটনাটি হল এই যে তিনি পিতার দিকে তাকিয়ে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে এই দুজনের মধ্য থেকে যে কোনো একজনকে জীবসাথী বানানোর দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারেনি। এখানেই তাঁর চরম ট্র্যাজিক পরিণতি নিষ্পাপ কৃষ্ণকুমারীর নিয়তির তপ্তস্পর্শে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভীমসিংহের নির্দেশে মনের কামনা বাসনা সমস্ত কিছুকে নিবারিত করে এক মর্মান্তিক পরিণতি তাকে গ্রাস

করেছে। শধু তাই নয়, নাটকের শেষ দৃশ্যে কাকা বলেন্দ্র সিংহের কাছ থেকে যখন কৃষ্ণকুমারী জানতে পেরেছে যে তার পিতাই তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছে, তখন তার সেই আর্তি 'কাকা আমার পিতারও কি এই ইচ্ছা'—এই উক্তি দর্শকচিত্তকে নাড়া দিয়েছে এবং সাথে সাথে তার আত্মহত্যা ট্র্যাজিক চরিত্রের পথ রচনা করেছে।

কৃষ্ণকুমারী এই বিষাদাত্মক নাটকের নায়িকা। নাট্যকাহিনির পরিণতি সম্বন্ধে লেখকের ধারণা আগে থেকে সুস্পষ্ট ছিল বলে, কৃষ্ণকুমারী চরিত্রটিকে পূর্বাপরই বিষাদে আচ্ছন্ন করে চিত্রিত করেছেন। পিতা ভীমসিংহের সংসার অনিশ্চয়তা ও অশান্তি দ্বারা বিক্ষুব্ধ, বাহ্য বিক্ষোভের তাড়নায় ভীমসিংহ তার পারিবারিক জীবনকে উপেক্ষা করে চলতে বাধ্য হয়েছেন। রাজকুমারী কৃষ্ণার সঙ্কে প্রথম সাক্ষাৎকারেই রাজাকে তাই অভিমানক্ষুব্ধ অভিযোগ শুনতে হয়—

"পিতা, আপনি অনেকদিন আমার উদ্যানে পদার্পণ করেন নাই, তা আজ একবার চলুন।"

ভীমসিংহ কন্যার আবদার সেদিন আর উপেক্ষা করতে পারেননি। কিন্তু এর মধ্যে থেকে তাদের রাজপরিবারের চিত্র সকলের স্পষ্ট হয়ে উঠল। রাজপ্রাসাদের অন্তরালে অধিকাংশ কুমারী রাজকন্যা যে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়, কৃষ্ণার জীবনেও তার বিশেষ ব্যতিক্রম ছিল বলে মনে হয় না। এই নিঃসঙ্গতা থেকেই তার মনে বিষাদের ভাব সঞ্চারিত হয়েছিল এবং এই বিষাদমগ্ন ভাবই তার জীবনের করুণ পরিণতির পক্ষে সহায়ক হয়েছে। কৃষ্ণার চরিত্র যদি সদাপ্রফুল্ল ও হাস্যময় হতো, তাহলে তার জীবনের পরিণতিও স্বতন্ত্র হতো। স্নেহসম্পর্কহীন নিঃসঙ্গ জীবনে সে নিরবচ্ছিন্ন বিষাদের ভার বহন করে গিয়েছে।

মধুসূদন কৃষ্ণকুমারীকে পরিপূর্ণ সহানুভূতি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, সে জন্যই তার সৃষ্টিও সার্থক হয়েছে, কারণ, সহানুভূতি ভিন্ন কোনো চরিত্রসৃষ্টিই সার্থক হতে পারে না। কৃষ্ণার জীবনের নিরবচ্ছিন্ন বিষাদ, কাতরতা থেকেই দেখতে পাওয়া যায় যে, তার চরিত্রের মধ্যেই আত্মহত্যা করবার প্রবৃত্তি সমাহিত হয়েছিল। কৃষ্ণকুমারী চরিত্র প্রসঙ্গে বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন—

> "বাংলা নাটকে 'কৃষ্ণকুমারী'র মধ্যেই সুস!ত চরিত্র সৃষ্টির সর্বপ্রথম পূর্ণা! প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে বাংলায় যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে, তাহাদের বিষয়বস্তু সাধারণত গুরুত্ব বর্জিত হওয়ার জন্য তাহাতে সমগ্রভাবে কোনো চরিত্র সৃষ্টি সুসঙ্গতি লাভ করিতে পারে নাই।" (বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা - ২১৬)।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের নামকরণ প্রমাণ করে এ নাটকের কেন্দ্রে রয়েছে কৃষ্ণাচরিত্র। কিন্তু নাটকের শেষে কৃষ্ণকুমারী যখন বিষপানে আত্মহত্যা করে, তার জননী যখন তার অনুসরণ করে এমনকি নিষ্ঠুর আমির যখন সেই কাহিনি শুনে বিস্মিত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধ সংলাপ উচ্চারণ করে, তখন দর্শকদের মন ট্র্যাজিক রসের প্রভাবে ভেসে যায় না। কেননা কৃষ্ণকুমারীর জীবনে একদিকে উদয়পুর রাজ্যের বিপুল বংশগরিমা, অন্যদিকে ভীমসিংহের মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টির যে সুযোগ তা মধুসূদন পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি। তার এই দ্বিধার কারণই শেক্সপীয়রের ট্র্যাজিক চরিত্রের মত কৃষ্ণকুমারী চরিত্রের সাফল্য এনে দিতে পারেনি।

সমগ্র আলোচনা শেষে বলা যায় মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকটি বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। তাই নাটকটির ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি আছে একথা সত্য। তা সত্ত্বেও মধুসূদন দত্ত

কৃষ্ণকুমারী চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রেখেছেন এবং তাকে ঘিরে নাটকের নামকরণও শিল্পসম্মত ও সার্থক হয়েছে।

৩০১.২.৮.১.২ : বিলাসবতী

বিলাসবতী চরিত্রটি অঙ্কনে মধুসূদন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করেছেন। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকম্' নাটকের বারবিলাসিনী বসন্তসেনা যেমন পণ্যানারী হয়েও চারুদত্তের প্রতি তার হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রেম নিবেদন না করে থাকতে পারেনি, তেমনি 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের বিলাসবতী চরিত্রটিও রূপোপজীবিনী হয়েও জগৎসিংহের সমস্ত চরিত্রদোষ সমেতই তাকে হৃদয় দান করেছে।

বিলাসবতীকে পাওয়া যায় জয়পুরের পটভূমিতে। এ নাটকে তার একটি জীবন ইতিহাসের ইঙ্গিত আছে। চরিত্রটি রচনায় মধুসূদনের প্রধান কৃতিত্ব হল তিনি বিলাসবতীকে শুধুমাত্র বারাঙ্গনা যেমন করতে চাননি, তেমনি একনিষ্ঠা সরলা প্রেমিকাও করে রাখেননি। জগৎ সিংহের জন্য তার হৃদয় যেমন সতী নারীর মত কাঁদে, অন্যদিকে ধনদাস বা ক্ষমাপ্রার্থী রাজার সঙ্গে কথোপকথনে তার বারাঙ্গনাসুলভ ভাবভঙ্গি বেরিয়ে আসে। বলা যায়, ভালোবাসায় কোমল, অতীত জীবনের স্মৃতিতে বেদনাময় আবার আক্রমণের মুহূর্তে তীক্ষ্ণ এই নারী যথেষ্ট পরিমাণে নাটকীয় হয়ে উঠেছে। এই নাটকে শেষপর্যন্ত বিলাসবতীরই জয় হয়। জগৎ সিংহ তার কাছে ফিরে আসে, অর্থাৎ তার ভালোবাসাকে সম্মান করেন মধুসূদন। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

৩০১.২.৮.১.৩ : মদনিকা

মদনিকা বিলাসবতীর সহচরী, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় যে এ চরিত্রটিও বিলাসবতীর মত রূপোপজীবিনী। কিন্তু চরিত্রটিকে মধুসূদন ভিন্নভাবে পরিকল্পিত করেছিলেন। তার প্রমাণ, কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে মদনিকা চরিত্রটি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, 'That মদনিকা will play the Deuce with ধনদাস।

নাটকে মদনিকার আবির্ভাব ঘটে প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে। এছাড়াও বিভিন্ন অঙ্কের বিভিন্ন গর্ভাঙ্কে তাকে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোনো প্রবল সংকটের সময় অনুপস্থিত, অর্থাৎ সে নাটকের কেন্দ্রবিন্দু নয়।

প্রথম আবির্ভাবেই তার বাইরের পরিচয় পাওয়া যায়। সে বিলাসবতীর সখী। বিলাসবতীকে সেই কৃষ্ণার খবর দেয়, সে বাইরের খবর রাখে। তার দু-একটি সংলাপে বোঝা যায় সে বিলাসবতীর পুরোপুরি বিপরীত। যে সমাজ পটভূমিতে বিলাসবতী বা কৃষ্ণকুমারী আত্মসমর্পণ করে সেখানে মদনিকা যেন নাট্যকাব্যের প্রতিবাদ।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক থেকে দেখা যায় পুরুষের ছদ্মবেশে মদনমোহন নাম গ্রহণ করে মদনিকা। আবার কৃষ্ণকুমারীর মত সরলা মেয়ের মনে কিভাবে সে প্রেম জাগায় তা-ও লক্ষ করার বিষয়।

বস্তুত মদনিকার মত কৌশলী চতুর কোনো চরিত্র, যে সব সমস্যার সমাধান করতে পারে অপরিসীম বুদ্ধি দিয়ে নাট্যসাহিত্যে এমন চরিত্র মেলা ভার। চরিত্রটির এই অসাধারণত্ব প্রকাশ করাতেই মধুসূদনের কৃতিত্ব।

৩০১.২.৮.১.৪ : অহল্যাবাঈ

মহিষী অহল্যাবাঈ সম্পর্কে মধুসূদন মন্তব্য করেছেন—

> "The queen of such an unfortunate prince, as the Rana Bheem Singh connot but be sad and grave."

উদরপুরের রানা হিন্দুকুলসূর্য কিন্তু তিনি রাহুগ্রস্ত। স্বামীও রাজ্যের বিপর্যয় মহিষীকে উদ্বিগ্ন ও বিষাদময় করে তুলেছি। স্বামীর অশান্তিতে তার জীবনও অশান্ত হয়েছে। বাঁচার ইচ্ছাশক্তি তার মধ্যে আর নেই। মহারাষ্ট্রপতির ত্রিশ লক্ষমুদ্রার বিনিময়ে রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ রানার মুখে শুনে তিনি আশ্বস্ত হয়ে কৃষ্ণার বিয়ের কথা তাকে বলেছেন এবং ভীমসেনের প্রণয়িনী পদ্মিনীদেবীর কথা উল্লেখ করে অজ্ঞাতসারে বিয়োগান্ত পরিণামের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। নাট্যকার মহিষীর স্বাধ্বী স্ত্রী ও জননীমূর্তি অঙ্কিত করেছেন। তাই স্বামীর প্রতি উদ্বেগপূর্ণ কর্তব্যনিষ্ঠা ও কন্যার প্রতি বাৎসল্য, তার চরিত্রকে পূর্ণতা দিয়েছে। জগৎসিংহের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবে তিনি আনন্দিত হয়েছেন এবং মা-র মতন স্নেহে চোখের জল ফেলেছেন। তিনি বলেছেন—

> "মহারাজ, আমার এ কোকিলটি এ বনস্থলী ছেড়ে গেলে কি আর আমি বাঁচব।"

আবার মানসিংহের প্রতি কন্যার অনুরাগের কথা তপস্বিনীর মুখে শুনে তিনিও রানাকে অনুরোধ করেছেন তাকে কন্যাদান করতে। কিন্তু জয়পুর ও মরুদেশের রাজদ্বয়ের প্রতিযোগিতার সূত্রধরে যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হবার সম্ভাবনা আছে এবং মানসিংহের পক্ষ মহারাষ্ট্রপতি সমর্থন করায় রানার ও রাজ্যের বিপদ ঘনীভূত হয়েছে, ভীমসিংহের কাছে এই কথা জেনে মহিষী নিজের কলাপকে দায়ী করে কান্না করেছেন। রানা আক্ষেপের সুরে বলেছেন যে, তার হৃদয়নিধি কৃষ্ণা থেকে তার সর্বনাশের সূচনা হতে চলেছে। এই কঠিন কথা শুনে জননীর হৃদয় আলোড়িত হয়েছে। তিনি বলেছেন,

> "বাছা, কেনই বা তোর এ অভাগিনীর গর্ভে জন্ম হয়েছিল।"

শেষ দৃশ্যে কৃষ্ণার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং কন্যার মৃত্যুর জন্য রানাকে দায়ী করে, শোকে ও অভিমানে নিজেও মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। শুধু বলে গেলেন—

> "তোমার হাতে আমার কৃষ্ণার রক্ত লেগে রয়েছে। মহারাজ, আমি তোমার কাছে এ জন্মের মতন বিদায় হলেম।"

৩০১.২.৮.১.৫ : তপস্বিনী

তপস্বিনী সংসারত্যাগী সন্ন্যাসিনী হলেও রানার পরিবারের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও এই সূত্রে তাদের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে মহিষীকে বলেছেন যে, তিনি চির উদাসিনী। ভবসংসারের কল্লোল তার কর্ণকুহরে প্রায়ই প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু ধর্মজীবনে উদাসিনী হলেও মানবিক বৃত্তির দিক থেকে তিনি রাজমহিষীর অন্তর! সখী ও কুমারী কৃষ্ণার পরম হিতৈষিণী। রাজপরিবারের দুঃখের অংশ তিনি গ্রহণ করেছেন ও তাদের চরম বিপর্যয়ের দিনে তিনি শোকাতুরা হয়ে কান্না করেছেন। তিনি তার হৃদয়কে সুখদুঃখে বিগতস্পহ করতে পারেননি, সন্ন্যাস জীবনের কৃচ্ছসাধনা তার চিত্তবৃত্তিকে শুষ্ক করতে পারেনি। তিনি স্বগতোক্তিতে বলেছেন—

> "আমি ভেবেছিলাম, যে অনিদ্রা, নিরাহার, কঠোর তপস্যা, এসকল সংসার মায়া-শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দান করে। তা কৈ? আমি যে মুক্তিলাভ করেছি, এমনও কোনোমতেই বোধ হয় না।"

বিধাতা যে হৃদয়বৃত্তি মানুষকে দান করেন তাকে নির্মূল করা যায় না। সেই হেতু সংসার ছাড়লেও দুঃখ মনকে অভিভূত করে, শোকে হৃদয় সন্তপ্ত হয়।

তিনি প্রথম থেকে অহল্যাবাঈ ও ভীমসিংহকে সান্ত্বনাদানের প্রয়াস করেছেন। রানার দুঃখের কথা শুনে তাকে বলেছেন যে, বিপুল রাজকুল কখনো শ্রীভ্রষ্ট হবে না। যেহেতু সংসারে তখনও একপদে ধর্ম আছে, সেইহেতু পুরুষোত্তম, পুণ্যভূমি ভারতকে বিস্মৃত হবে না। জগৎসিংহের সঙ্গে কৃষ্ণার বিবাহ প্রস্তাবে তিনি সুখী হয়েছেন, আবার তার কাছ থেকে মানসিংহের প্রতি অনুরাগের কথা জানতে পেরে রানাকে তার হাতে কন্যাকে সম্প্রদান করতে অনুরোধ করেছেন। রানা দুই রাজার প্রতিদ্বন্দ্বিতাই রাজ্যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হবার কথা বলে কৃষ্ণাকে দায়ী করলে, মহিষী কাঁদতে থাকে। তখন এই তপস্বিনীই তাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। আবার, কৃষ্ণার কাছে পদ্মিনীর আবির্ভাবের কথা জেনে তাকে সেই স্থান থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গেছেন। রাজ্যের সম্ভাব্য বিপদের ইঙ্গিত তিনি আগেই স্বপ্নযোগে পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই কথা কারো কাছে তিনি বলেননি। পঞ্চমাঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে মহিষীর দুঃস্বপ্নের কাহিনি শুনে তিনি তাকে বলেছেন যে, স্বপ্নে মন্দ দেখলে তার ফল ভাল হয়ে থাকে। কৃষ্ণার মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে তিনি কান্না করেছেন ও মহিষীর জীবনাবসান যে বিধাতার বিড়ম্বনার জন্য এ ভেবে তিনি নিজেকে সংযত রাখতে পারেননি। তপস্বিনী চরিত্রের মাধ্যমে মধুসূদন অলৌকিকতার রহস্য ও রোমান্সের মাধুর্যকে বাস্তব জীবন-জিজ্ঞাসার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন।

৩০১.২.৮.২ : পুরুষ চরিত্র

৩০১.২.৮.২.১ : ভীমসিংহ

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথম দৃশ্যে প্রথম ভীমসিংহের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। রাজভৃত্যের মাধ্যমে কতগুলি চিঠি প্রেরণ করে স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে ভীমসিংহের যাত্রা শুরু হয়—'হে বিধাতা একেই কি লোকে রাজভোগ বলে?' তার এই প্রথম উক্তিতেই আমরা বুঝতে পারি যে তিনি রাজ্যরক্ষার সঙ্কটে পড়েছেন এবং তা সৃষ্টি হয়েছে তার একমাত্র সুন্দরী কন্যা কৃষ্ণকুমারীকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ একদিকে কন্যা কৃষ্ণকুমারী এবং অন্যদিকে রাজ্যের চরম সংকট—এই দুই ভিন্ন আবর্তের মধ্য দিয়েই চরিত্রটির সূত্রপাত।

আপাতদৃষ্টিতে লীয়রের সঙ্গে ভীমসিংহের সাদৃশ্য দেখা যেতে পারে। দুজনেই অসহায় ও দুর্বল। কিন্তু লীয়র রাজ্যহারা ও কন্যাদ্বয় কর্তৃক বিতাড়িত তিনি বলেছেন—

> "You see me here, you gods, a poor old man, As full of grief as age; wretched in both."

গ্লষ্টার তার উন্মত্ত দশা দেখে বলেছেন, 'O ruined piece of nature' ভীমসিংহ লীয়রের মত বৃদ্ধ ও অশক্ত নন। তিনি রাজসিংহাসনেও অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি নিজেকে সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি নিজে তার অসহায় নিষ্ক্রিয় জীবন সম্পর্কে সচেতন। তিনি পঞ্চমাঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে মন্ত্রীকে বলেছেন—

> "হায়, এ শৈলরাজের বংশে আমার মতন কাপুরুষ আর কে কবে জন্মগ্রহণ করেছে? ব্যাধের ভয়ে শৃগাল গহ্বরে প্রবেশ করে, কিন্তু সিংহের কি সে রীতি?"

তিনি মুখে এই কথা বললেও ক্ষত্রিয় বীরের মত আচরণ পালন করতে পারেননি, ঘটনাবলীর স্রোতে আত্মসমর্পণ করেছেন।

চরিত্র হিসেবে জগৎসিংহের ঠিক বিপরীত প্রান্তে রাখা যায় ভীমসিংহকে। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক থেকে জানা যায় ভীমসিংহ রাজপুতানার একজন পরিচিত মানুষ। সূচনাপূর্ব থেকে বিষণ্ণ মনে হয়। তার বীরত্বজ্ঞাপক সংলাপ নাটকে নেই। বস্তুতঃ তিনি যেন একজন গৃহস্থ মানুষ। যে কন্যাকে স্নেহ করে, স্ত্রীর প্রতি যত্নবান, একজন সাধারণ মানুষ। রাজনৈতিক সংকটের মুখে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত তিনি নিতে পারেন না। অসহায়ভাবে তার সামনে আত্মসমর্পণ করেন।

৩০১.২.৮.২.২ : জগৎসিংহ

জগৎসিংহকে নাট্যকার ভীমসিংহের বিপরীত চরিত্ররূপে গড়ে তুলেছেন। প্রতিনায়কের মর্যাদা যে জগৎসিংহের প্রাপ্য নয় তা তার একটি পত্রপাঠ করলেই আমরা বুঝতে পারি। তিনি লিখেছেন—

> "I have tried to represent Juggut Sing as I find him in History, a some what silly and voluptuous fellow."

চরিত্রটিকে নাটকে শারীরিকভাবে পাওয়া যায় মোট তিনটি দৃশ্যে—১/১, ৪/১-২ গর্ভাঙ্কে। জগৎসিংহ খুব বেশিবার আসেন না আমাদের সামনে, কিন্তু তাঁর প্রভাব নাট্যঘটনার ওপর সর্বব্যাপী ছায়া ফেলেছে।

প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কটি এই চরিত্রের Exposition-পর্ব। এই দৃশ্যেই তার চরিত্রের সেই সকল গুণগুলি বেরিয়ে আসে যা নাট্যকাহিনীকে প্রভাবিত করেছে। এই অংশে এক লম্পট, নারীলোলুপ, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনাহীন। রাজকার্যে অমনোযোগী এক রাজার চেহারা উঠে আসে। জগৎসিংহকে আবার দেখা যায় চতুর্থ অঙ্কের প্রথম ও দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে। এখানে নাট্যঘটনা অনেক দূরই অগ্রসর হয়েছে। এখানে দেখা যায় বুদ্ধের উদ্যোগকারী জগৎসিংহকে। বস্তুতপক্ষে জগৎসিংহ চরিত্রটি নেতিবাচক চরিত্র হিসেবে নাটকে স্থান পেয়েছে।

৩০১.২.৮.২.৩ : বলেন্দ্রসিংহ

বলেন্দ্রসিংহ রাজভ্রাতা ও সেনাপতি। ভীমসিংহের পিতার অবৈধ সন্তান বলেন্দ্রসিংহকে টড বলেছেন—'যৌয়াণ দাস' এবং তিনি ভীমসিংহের 'natural brother' এই বলেন্দ্রসিংহ সম্পর্কে মধুসূদনের উক্তি—

> "I wish Ballender to be serious and light, like the 'Bastard in King John."

তবে শেক্সপীয়রের নাটকে যে ক্ষেত্রে 'Philip the Bastard' 'Robert Poulconbridge'-এর 'half brother' সে ক্ষেত্রে বলেন্দ্র ভীমসিংহের পিতার অবৈধ সন্তান।

অবৈধ সন্তান হয়েও কৃষ্ণকুমারী নাটকে এই দুর্বলচিত্ত পুরুষদের মধ্যে একটি চরিত্রই জ্যোতিতে ভাস্বর, সেটি হল বলেন্দ্রসিংহ। টডের কাহিনীর পরিচয় মধুসূদন একেবারেই বদলে দিয়েছেন।

বলেন্দ্রসিংহকে প্রথম দেখা যায় তৃতীয়াঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে। এর পরই তাকে দেখা যায় পঞ্চমাঙ্কে দুটি দৃশ্যে প্রবল সংকটের মধ্যে।

শেষ অঙ্কের দুটি দৃশ্যে বলেন্দ্র সিংহের যে পরিচয় আমরা পাই, তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য মধুসূদন আগের দুটি দৃশ্যেই তার প্রস্তুতি নিয়েছেন। এখানে তিনি যেন একজন চপল, পরিহাসপ্রিয়, প্রাণবান মানুষ, রাজপুরুষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারেও তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। আবার কৃষ্ণকুমারীর হত্যার আদেশ পালন করতে রাজি হওয়া ও কার্যক্ষেত্রে তাকে বাস্তবে পরিণত করতে না পারার মধ্যে তার মানবিকতা বোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

৩০১.২.৮.২.৪ : ধনদাস

অর্থলোলুপ চরিত্র হিসেবে ধনদাসকে আমরা নাটকে প্রত্যক্ষ করি। ইয়াগো চরিত্রের সাদৃশ্যে নাট্যকার ধনদাসকে গড়ে তুলতে চাননি। অত্যন্ত চতুর এই চরিত্রটিকে মধুসূদন অত্যন্ত স্বাধীনভাবে অঙ্কন করেছেন। মদনিকাকে বাদ দিলে একমাত্র এই চরিত্রটিকে আমরা জয়পুর এবং উদয়পুরে সক্রিয় দেখতে পাই। রাজার সহচররূপে থেকে তার একমাত্র কর্ম ছিল অর্থ সংগ্রহ। তার কথায়—

> "আমরাও রাজ অনুচর; তা আমরা যদি রাজপূজায় অর্থলাভ না করি, তবে আর কিসে করব।"

আবার অসৎ, দুষ্ট, অন্যকে বিপদে ফেলতে সে ছিল সিদ্ধহস্ত। তবে নাট্যকার নাটকে গাম্ভীর্যের সঙ্গে হাসির যে সংমিশ্রণ ঘটাতে চেয়েছেন সে ক্ষেত্রে এই চরিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

চরিত্রটির সঙ্গে ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের বিদূষক চরিত্রের মিল লক্ষণীয়। ধনদাস মধুসূদনের তথা উনিশ শতকীয় বাংলা নাটকের স্মৃতিধার্য চরিত্রায়ন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

৩০১.২.৮.২.৫ : মন্ত্রী

অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মন্ত্রী চরিত্র। এই নাটকে দুজন মন্ত্রী চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। একজন নারায়ণমিশ্র জগৎসিংহের মন্ত্রী ও অপরজন সত্যদাস রানা ভীমসিংহের মন্ত্রী। এই দুজন মন্ত্রীই প্রায় একরকম আচরণের পরিচয় দিয়েছেন। নাটকের মূল কার্যের অংশীভূত হওয়ায় মেবারের মন্ত্রী সত্যদাস কিছু গুরুত্ব অর্জন করেছেন। টড তার নাম দিয়েছেন সতীদাস। আলস্যপরায়ণ, ইন্দ্রিয়াসক্ত রাজা জগৎসিংহ তার মন্ত্রীকে দেখে বিরক্ত হন। কারণ তিনি তার বিশ্রামের ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে চান। রাজা কৃষ্ণার পাণিপ্রার্থী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মন্ত্রী মরুদেশের রাজা মানসিংহের কথা বলেন। এতে রাজা রেগে গিয়ে তাকে বলেন—

> "আমি এ রাজকন্যাকে বরণ করবো।"

ধনদাসের সঙ্গে মন্ত্রী সৈন্যসামন্ত পাঠাতে চাননি কারণ অর্থের অপব্যয় তিনি করতে চাননা। রাজা তাতে কান দেননি। ধনদাসের দৌত্যকার্য ব্যর্থ হবার পরে মন্ত্রীর কথায় রাজা বুঝতে পারে যে, বিয়ে উপলক্ষে গোলযোগ সৃষ্টি করে অর্থ উপার্জন করা ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য। মন্ত্রী রাজাকে নানাভাবে যুদ্ধ থেকে সরে আসার পরামর্শ দিয়েছেন। তুচ্ছ অগ্নিকণা থেকে যে ঘোরতর দাবানল সৃষ্টি হয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, সেকথা চিন্তা করে মন্ত্রী ভয় পেয়েছে। রাজাও সমগ্র দেশের মঙ্গলের কথা ভেবে মন্ত্রী রাজাকে 'বিষম কাণ্ডে প্রবৃত্ত' না হবার কথা বলেছেন, কিন্তু জগৎসিংহ অপযশের ভয়ে তার পরামর্শ গ্রহণ করেননি। মন্ত্রী আক্ষেপের সুরে বলেছে। 'বিধাতার নিবন্ধকে কে খণ্ডন কত্যে পারে'। নারায়ণ মিশ্রকে কোনো গুরুতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়নি, কিন্তু রানার মন্ত্রী সত্যদাসকে ভীমসিংহের কুলমর্যাদা ও উদয়পুরের সমূহ বিপদের দায়িত্ব প্রতিপালন করতে হয়েছে। কুমারী কৃষ্ণাকে নিয়ে জয়পুর ও মরুদেশের রাজার মধ্যে যে সংঘর্ষ অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল তার প্রতিক্রিয়া উদয়পুরের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠবে। আবার তাদের এই বিরোধের সুযোগ নিয়ে মহারাষ্ট্রপতি ও নবাব আমীর খাঁ নিজেদের লালসা ও লোভ চরিতার্থ করবার জন্য উদয়পুরের সর্বনাশ সাধনে বদ্ধপরিকর হল। অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির চিঠি পেলে রানা যখন বিচলিত ও বলেন্দ্রসিংহ কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তখন মন্ত্রী কৃষ্ণাকে বিসর্জনের সমর্থন জানিয়ে বলেছেন—

"এ রোগের এই ভিন্ন আর কোনো ঔষধ নাই।"

তিনি রানাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, উদরপুর রাজবংশের সতী ললনাগন গণ বংশের মানরক্ষায় অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে দেহত্যাগ করেছেন। যিনি নরপতি তিনি প্রজাগণের পিতাস্বরূপ। বহুজনের হিতের জন্য একজনকে বিসর্জন দিতে তার কুণ্ঠাবোধ করা কর্তব্য নয়। মন্ত্রী বিচলিত পিতৃহৃদয়কে এই বলে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছেন—'যে বিধাতা হতে শোকের সৃষ্টি হয়েছে, তিনিই আবার সেই শোককে অল্পজীবী করেছেন।' সুতরাং শোক চিরস্থায়ী নয়। মন্ত্রী পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বলেছিলেন যে, রাজকুমারীর মৃত্যু ভিন্ন পরিত্রাণলাভের কোনো উপায় নেই। তিনি রানাকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন এই বলে—

"মহারাজ, এ সকল বিধাতার ইচ্ছা বৈ ত নয়।"

রানার উন্মত্ত অবস্থা, কৃষ্ণার আত্মহনন ও মহিষীর মৃত্যু মন্ত্রীকেও বিচলিত করেছে। তিনি বলেন্দ্রসিংহকে বলেছেন—

"আমি চিরকাল এই বংশের অধীন, আমাকে কি শেষে এই দেখতে হল।"

এছাড়াও তিনি তাঁর শোক সামলে কর্তব্যপালন বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছেন ও রাজার ভাইকেও কর্তব্যকর্মে অবহিত করবার জন্য প্রয়াস করেছেন।

৩০১.২.৮.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'ধনদাস-বিলাসবতী-মদনিকা'—উপকাহিনিটি মূল কাহিনিকে কতটা সাহায্য করেছে তা আলোচনা করো।

২। 'কৃষ্ণকুমারী' চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো। কৃষ্ণকুমারী চরিত্রসৃজনে লেখকের দক্ষতার পরিচয়া দাও।

৩। অপ্রধান নারী চরিত্রগুলি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪। ভীমসিংহ কি ট্র্যাজিক চরিত্র? আলোচনা করো।

৫। অপ্রধান পুরুষচরিত্রগুলি কি প্রয়োজনীয় নাটকের পক্ষে? ব্যাখ্যা করো।

৬. 'কৃষ্ণকুমারী'র গঠন কৌশল সবিস্তারে আলোচনা করো।

৭। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের নায়ক কে? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

৮। বিলাসবতী–ধনদাস–মদনিকা–'কৃষ্মকুমারী' নাটকে কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে? তোমার অভিমত লিপিবদ্ধ করো।

৩০১.২.৮.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস — ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য

২। বাংলা নাটকের ইতিহাস — ড. অজিত কুমার ঘোষ

৩। নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা — ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য

৪। নাট্য আকাদেমী পত্রিকা (৩য় খন্ড)

৫। সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ড. কুন্তল চট্টোপাধ্যায়

৬। কৃষ্ণকুমারী — মূল নাটক

৭। কৃষ্ণকুমারী — ড. সৌমিত্র বসু সম্পাদিত

৮। কৃষ্ণকুমারী — ড. ভবানী গোপাল সান্ন্যাল সম্পাদিত

৯। কৃষ্ণকুমারী — ড. অলোক রায় সম্পাদিত

১০। কৃষ্ণকুমারী — ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

১১। কৃষ্ণকুমারী — ড. অজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

১২। সংলাপ ও ভিন্ন প্রসঙ্গ — ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩। বাংলা নাটকের টেকনিক — শ্রী চিত্তরঞ্জন লাহা

১৪। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস — ড. ক্ষেত্রগুপ্ত

১৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস — ড. দেবেশ কুমার আচার্য; (আধুনিক যুগ)

১৬। মাইকেল মধুসূদনের জীবন-চরিত্র — যোগীন্দ্রনাথ বসু

১৭। বাংলা নাটকে শেক্সপীয়ারের প্রভাব — ড. ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮। ইতিহাস ও সংস্কৃতি — ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯। নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার — ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য

২০। নাটকের কথা — অজিত কুমার ঘোষ

————

পর্যায়গ্রন্থ - ৩

একক - ৯

একেই কি বলে সভ্যতা? নাটকের সাধারণ পরিচয়

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.৩.৯.১ : প্রস্তাবনা

৩০১.৩.৯.২ : লেখক পরিচিতি

৩০১.৩.৯.৩ : 'একেই কি বলে সভ্যতা?' নাটকের সাধারণ পরিচয়

৩০১.৩.৯.৪ : নাটকের ভাববস্তু

৩০১.৩.৯.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০১.৩.৯.১ : প্রস্তাবনা

নব্য বাংলা সাহিত্য পূর্ণ মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করল মধুসূদন দত্তের সাধনায়। কালীপ্রসন্ন সিংহ আয়োজিত কবি সম্বর্ধনায় মধুসূদন দত্তের যথার্থ মূল্যায়ন হয়েছে বলা যায়। সম্বর্ধনা পত্রে উল্লেখিত— "আপনি বাঙ্গালা ভাষার যে অনুত্তম অশ্রুতপূর্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, ... আপনি বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন।" বাংলা ভাষার আদি কবি হিসাবে মধুসূদন দত্তকে আখ্যা দেওয়া একেবারেই অত্যুক্তির নয়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর 'স্বর্গারোহণ' কবিতায় মধু কবির স্মৃতিতর্পণ করেছেন, তাঁকে স্বর্গ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। বাংলা কাব্য—নাটকের যথার্থ পথচলা মধুকবির হাত ধরেই। বিষয়—আঙ্গিকের নতুনত্বে বাংলা কাব্য ও নাটক বিশ্ব দরবারে পরিচয় লাভ করল তাঁর লেখনিকে আশ্রয় করেই। পুরাতনকে নবরূপ দান করে, অভিনয়ের জন্য দর্শকরুচিকে প্রাধান্য দিয়ে নাটক রচনায়, ঐতিহাসিক ট্রাজেডি রচনা করে, প্রহসনরচনার মধ্য দিয়ে সময়-সমাজের বাস্তবরূপ প্রকাশকল্পে, সাহিত্যিক মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য, পত্রকাব্য, সনেট রচনার মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের অভিমুখ ভিন্নখাতে প্রবাহিত করেছেন।

৩০১.৩.৯.২ : লেখক পরিচিতি

মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ফারসি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। মধুসূদনের সাতবছর বয়সে রাজনারায়ণ দত্ত পরিবারবর্গ নিয়ে

খিদিরপুরে বসতি স্থাপন করেন। মধুসূদনের মা জাহ্নবী দেবীর কাছেই তাঁর শৈশবশিক্ষা শুরু হয়, রামায়ণ-মহাভারতের প্রতি তাঁর আগ্রহ মায়ের প্রভাবেই। তাঁর পড়াশোনা প্রথমে হিন্দু কলেজে তারপর বিশপস কলেজে। হিন্দু কলেজ তখন বঙ্গদেশের শিক্ষাঙ্গণের সর্বোচ্চ স্থানে বিরাজ করছে। ডিরোজিও এই কলেজের শিক্ষক ছিলেন। কাপ্তেন রিচার্ডসন, গণিতশাস্ত্রবিদ রিজ, হালফোর্ড, ক্লিন্ট, জোন্স সাহেব, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখের সাহচর্যে তাঁর বিদ্যার্জন। নতুন মানবমন্ত্রে বিশ্বাস,পাশ্চাত্য জীবনতন্ত্রে আসক্তি, গভীর ইংরেজি সাহিত্যপ্রীতি, দেশীয় আচার ও ভাবনার প্রতি অশ্রদ্ধা—সব বিষয়ে তাঁর বিদ্রোহী মনোভাব। তাঁর চারিত্রিক সত্তার পরিচায়ক, তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ-বিলাস-ব্যসনে-বাকপটুতায়-বুদ্ধির দীপ্তিতে তিনি বন্ধুদেরও কেন্দ্রে ছিলেন। কখনও ফারসি গজল গান গেয়ে, কখনও সাহেব-নাপিতের দোকানে চুল কাটিয়ে, কখনো শেক্সপিয়র-বায়রনের কবিতা আবৃত্তি করে বন্ধুদের চমকে দিতেন। ইংরেজি, সংস্কৃত, গ্রিক, লাতিন, তামিল, হিব্রু, তেলেগু বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী তিনি। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর কবিতা 'জ্ঞানান্বেষণ', Bengal Spectator– Literary Gleaner– Calcutta Literary Gazette– Literary Blossom– Comet ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। Atheneum–Hindu Chronicle– Hindu Patriot– Spectator পত্রিকার সম্পাদক, সহসম্পাদক ছিলেন তিনি। 'Madras Circulator and General Chronicle' পত্রিকায় 'Timothy Penpoem' ছদ্মনামে অসংখ্য গীতিকবিতা, সনেট, খন্ডকাব্য প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে কবির প্রথম প্রকাশিত রচনা Visions of the past এবং The Captive Ladie. মাদ্রাজে প্রদত্ত বক্তৃতা 'The Anglo-Saxon and the Hindu' নামে গ্রন্থবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়। 'ক্যাপটিভ লেডি' কলকাতায় সমাদৃত হয়নি। বাংলাদেশের শিক্ষাসচিব বেথুন সাহেব মধুসূদনকে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দেন। ১৮৫৬ সালে কবি কলকাতায় ফিরে আসেন। মধুকবির কাছে বাংলা সাহিত্য রচনার ক্ষেত্র হয়ে উঠল এই সময় এবং স্থান কলকাতা। 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে কবির সঙ্গে ১৮৫৮ সালে বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চের ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। তারপর একে একে 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯), 'একেই কি বলে সভ্যতা?' (১৮৬০), 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০), 'পদ্মাবতী' (১৮৬০), 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১), 'মায়া-কানন' (১৮৭৪) প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন রচনা। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে বিতর্কের উত্তরে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০) রচনা। ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি করলেন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬১), 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১), 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২), 'চতুর্দশপদীকবিতাবলী' (১৮৬৬)। 'শমিষ্ঠা' ও দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করলেন। 'মায়া-কানন' নামক নাটক, 'হেকটর-বধ' নামক গদ্য আখ্যান, অসংখ্য ইংরেজি কবিতা, বিভিন্ন জনকে লেখা ১৮৪টি ইংরেজিতে লেখা চিঠি, ইংরেজি ভাষায় লেখা প্রবন্ধ রচনা করে বাংলা সাহিত্যের পাঠককে বৈচিত্র্যের আস্বাদ দিলেন। বাংলা সাহিত্য বিশ্বায়িত হলো।

তাঁর সাহিত্যের বিষয় একান্তই দেশীয় ঐতিহ্যের কিন্তু তার প্রকাশের সংরূপ পাশ্চাত্যের। বাংলা কাব্যক্ষেত্রে সাহিত্যিক মহাকাব্য, পত্রকাব্য, সনেট, গীতিকাব্য, নীতিগর্ভ কবিতা ছিলনা। মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে তা আনয়ন করলেন। ঐতিহাসিক ট্রাজেডি রচনা করে স্বদেশপ্রেমের বার্তা প্রদান করলেন। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের মাধ্যমে নারীর অগ্রণী ভূমিকাকে সূচিত করলেন। চরিত্রের জন্য ভাষা বয়ন করলেন

লেখক। নতুন ধরনের চরিত্রের মুখে ভাষা সৃজিত হল। শর্মিষ্ঠা,পদ্মাবতী, কৃষ্ণা, তপস্বিনী, অহল্যা, মদনিকা, প্রমীলা, শকুন্তলা, জনা, কেকয়ী, সূর্পনখা, উর্বশী, তারা লেখকের সম্মতি আদায়ের নতুন ধরনের শিল্পকলা আবিষ্কার করলেন 'বীরাঙ্গনা কাব্য' কে সামনে রেখে। নারী তার প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পেল—"আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে?" (প্রমীলা, মেঘনাদবধ কাব্য), "এ জন্মে কাকেও মেয়েমানুষ বলে ঘৃণা করো না।" (মদনিকা,'কৃষ্ণকুমারী'); "পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতি" (কেকয়ী, 'বীরাঙ্গনা কাব্য')। কাব্য-নাটকেও অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করলেন সংলাপের ভাষায়। সনেট নামক নতুন ছন্দ আমদানি করলেন বাংলায়। বিষয় ও আঙ্গিকের বাঁক বদলের স্বাক্ষর রেখে গেলেন বাংলা সাহিত্যে।

৩০১.৩.৯.৩ : 'একেই কি বলে সভ্যতা?' নাটকের সাধারণ পরিচয়

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মধুসূদনকে লেখা একপত্রে (১৮৫৯ সাল, ৮ই মে) Domestic Farce লেখার অনুরোধ জানান। তারই ফলশ্রুতি এই প্রহসনটি। বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্য প্রহসনটি লেখা হলেও প্রহসনটি সেখানে অভিনীত হয়নি। প্রভাবশালী মহল থেকে আপত্তি আসায় বেলগাছিয়া নাট্যশালার কর্ণধার প্রহসনটি অভিনয়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। অভিনীত না হলেও প্রহসনটি ১৮৬০ সালের প্রথমদিকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে উল্লেখিত "একেই কি বলে সভ্যতা?/(প্রহসন)/শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত/প্রণীত/"ন প্রিয়ং/প্রবক্তু মিচ্ছন্তি মৃষা হিতৈষিণঃঊ" কিরাতার্জুনীয়/কলিকাতা/শ্রীযূত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহু বাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যক ভবনে ইস্টান্ হোপযন্ত্রে যন্ত্রিত।/সন ১২৬৬ সাল।"

পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৮। মধুসূদনের জীবিতকালে আর একটিমাত্র সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৬৯ বঙ্গাব্দে। তবে প্রহসনটি বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত না হওয়ায় মধুসূদন মনে প্রাণে আহত হয়েছিলেন। প্রথম অভিনয় হয় ১৮৬৫ সালের ১৮ জুলাই শোভাবাজার থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটিতে। ইংরেজি 'কমেডি অব ম্যানারস'-এর রীতি ও রসকে আত্তীকরণ করে প্রহসনটি রচনা করেন।কলকাতার কথ্যভাষা ও স্ল্যাংকে স্থান দিয়েছিলেন, যশোহরের গ্রাম্যভাষাকেও সংলাপে স্থান দিয়েছেন নাট্যকার। প্রহসনটি দুটি অঙ্ক এবং চারটি গর্ভাঙ্কে বিভাজিত। প্রহসনে পুরুষ চরিত্র হিসাবে রয়েছে কর্তা মহাশয়, নববাবু, কালীবাবু, বাবাজী, বৈদ্যনাথ, বাবুদল, সারজন, চৌকিদার, যন্ত্রীগণ, খানসামা, বেহারা, দরওয়ান, মালী, বরফয়ালা, মুটিয়াদ্বয়, মাতাল এবং নারী চরিত্র হিসাবে রয়েছে—গৃহিণী, প্রসন্নময়ী, নৃত্যকালী, কমলা, পয়োধরী, নিতম্বিনী, বারবিলাসিনীদ্বয়।

প্রহসনের ঘটনাস্থল—

প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক — নববাবুর গৃহ

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক — সিকদারপাড়া স্ট্রীট

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক — সভা

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক —নববাবুর শয়নমন্দির

৩০১.৩.৯.৪ : নাটকের ভাববস্তু

১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। গ্রহণ উৎসুক ছাত্রদের তিনি জ্ঞানস্পৃহা জাগালেন, উদ্বুদ্ধ করলেন নিজস্বভাবে চিন্তা করতে। ডিরোজিওর প্রেরণায় বাঙালি যুবকেরা যুক্তিবাদী হয়ে অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শিখেছিলেন। প্রচলিত হিন্দুধর্মের অনাচার, বীভৎসতা এবং হিন্দু সমাজের সর্বাঙ্গে ক্ষয়ের চিহ্ন তাঁদের চোখে পড়ল। নব অর্জিত যুক্তির সাহায্যে তাঁরা প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, অন্ধ সংস্কারকে আক্রমণ করলেন। পৈতে ত্যাগ করলেন, গায়ত্রী মন্ত্রের জায়গা নিল পোপ—ড্রাইডেনের কবিতা, মন্ত্রের প্যারডি তৈরি হল, স্বার্থলোভী গুরু-পুরোহিতের ওপর এল ঘৃণা, হিন্দুধর্মনিষিদ্ধ আহারে রুচি হল। ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে ডিরোজিও তাঁর ঘনিষ্ঠ ছাত্রবন্ধুদের নিয়ে গঠন করলেন 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েসন'। যেখানে সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় — সব বিষয় নিয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা হয়। ১৮৩১ এর ৫ই মে 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকায় এবং ১৮৩১ এর ১৪ই মে 'সমাচার দর্পণ'-এ তরুণ যুবকদের আচরণ সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হয়। জনৈক এক হিন্দু কলেজ ছাত্রের অভিনব আচরণ দেখে তার পিতা আক্ষেপের সুরে বলেন "ওরে আমি কি ঝকমারি করে তোরে হিন্দু কলেজে দিয়াছিলাম যে তোর জন্যে আমার জাতি মান সমুদায় গেল মহাশয় গো এই কুসন্তানের নিমিত্তে আমি একঘরে হইয়াছি, ধর্মসভায় যাইতে পারি না"। (বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, স্বপন বসু, পুস্তক বিপণি, আগষ্ট ২০১৬,(ষষ্ঠ সং), পৃ: ২৪-২৫)। এই সম্প্রদায় পরিচিত হল নব্য বঙ্গ সম্প্রদায় বা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে। এরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত। এরা প্রকাশ্যে মদ্যপান করতেন, প্রণাম বা কোলাকুলির পরিবর্তে করমর্দন করতেন। মুসলমান খানসামার রান্না তাদের প্রিয় ছিল। ১৮৪২ এ হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের জন্যও কলকাতায় একটি সভা স্থাপনের পরিকল্পনা করেন তাঁরা—'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা' সভা। পুনর্বিবাহ, বিধবা বিবাহের পক্ষে রীতিমত গণ আন্দোলন গড়ে ওঠে। বিদ্যাসাগরের আন্দোলনে তাঁরা সমর্থন করেন, কৌলীন্য প্রথার কুফল ও স্ত্রী শিক্ষার উপযোগিতা মানুষকে বোঝাতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন তাঁরা। এই সমসময়ের ঘটনা নাট্যকার মধুসূদন দত্ত তাঁর প্রহসনে দুটি অঙ্ক ও চারটি দৃশ্যে বিন্যস্ত করেন।

প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের দৃশ্যপট নবকুমারবাবুর গৃহ। নবকুমারবাবু, কালীনাথবাবু, কর্তা মহাশয়ের (বৈদ্যনাথ দু-এক জায়গায়) সংলাপে, কথোপকথনে কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। নবকুমারবাবু ও কালীনাথবাবুর কথোপকথনে এই সময়কালের তরুণ সমাজের জীবনরীতি- সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাবে। নববাবুর বাবা কর্তামশায় বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসেছেন। কর্তামশায়ের অনুপস্থিতিতে কালীবাবুর আনাগোনা ভালোই ছিল নববাবুর বাড়িতে। সেখানে মদ্যপান থেকে ধর্মবিরোধী অনেক কাজই চলত। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাতে নববাবুকে দিয়ে সভাপতিত্ব করাবেন—এমত সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু কর্তামশায়ের আবির্ভাবে অনিশ্চয়তার কালো মেঘ ঘনিয়ে এল। কালীবাবুর কথাতে—"এ বুড়ো বেটা কি অকালের বাদল হয়ে আমাদের প্লেজার নষ্ট কত্যে এল?" (মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ২৩৯) এসব চিন্তা করতে করতে কালীবাবু মদ্যপান করে এবং পরামর্শের মাধ্যমে ঠিক করে নেয় কর্তামশায়ের কাছে কীভাবে নিজের পরিচয় দেবেন।

আর কীভাবেই বা নবকুমারকে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় নিয়ে যাবার অনুমতি পাওয়া যায়। কালীবাবুর সত্যকার যে পরিচয় এবং যে পরিচয় দেওয়া হয় কর্তাবাবুর কাছে, তাতে আকাশ পাতাল তফাৎ।নব্যযুবকেরা শ্রীমদ্ভাগবত এবং জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' নাম জানেনা, উচ্চারণই করতে পারেনা। তাদের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত গীতা হয়ে যায় শ্রীমতী ভগবতীর গীত। এবং 'গীতগোবিন্দ' হয় বিন্দা দূতীর গীত। তারা সঠিক ভাবে ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতিও জানেনা। আর পাশ্চাত্যের সেই আদর্শ অনুসরণ করার সক্ষমতা তাদের ছিলনা। নববাবুর কৌশলে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় যাবার অনুমতি পায়। কিন্তু সন্দেহ বশত: তাদের অনুসরণ করার জন্য বাবাজীকে পাঠানো হয়। কালীবাবুর বেশ্যাপল্লী-সোনাগাছিতে নিয়মিত যাতায়াত, মদ্যাসক্তি—শ্রেণীচরিত্রকে দ্যোতিত করে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের দৃশ্যপট সিকদারপাড়া স্ট্রীট।আগের গর্ভাঙ্কেই নবকুমারকে সিকদারপাড়াস্ট্রীটে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় নিয়ে যাবার কথা হয়েছিল। আদৌ সেই সভায় যাচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত হতেই কর্তামশায় বাবাজীকে তাদের চলনগতি বোঝার জন্য পাঠিয়েছেন। বাবাজীর দৃষ্টিতে সিকদারপাড়া স্ট্রীটের একটা চিত্র তুলে ধরেছেন নাট্যকার। বৈষ্ণব বাবাজী প্রতি পদক্ষেপে মাতাল, বারবিলাসিনী, কশবী তথা বেশ্যা, সারজন, চৌকিদাররের মুখোমুখি হয়েছেন। যে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার খোঁজে এসেছেন, আদৌ তা বাস্তবে আছে কিনা—তা দেখতে এসে বাবাজীর মতো চরিত্রবিভিন্ন মানুষের হাসির খোরাক হয়ে উঠেছেন। প্রথম বারবিলাসিনীর কথায় বাবাজী 'যেন তুলসীবনের বাঘ।' সারজন, চৌকিদারের অবস্থান স্পষ্ট করা হয়েছে। সারজন ঘুষ নেয়, ভারতীয়দের 'ব্লাডী নিগর' বলে অপমান করেছে। দুজন মুটিয়ার কথোপকথনে হিন্দুদের সাম্প্রতিক অবস্থান কিছুটা উঠে এসেছে। বিশেষ করে, নব্যবঙ্গ সম্প্রদায় যে আল্লা- ঈশ্বর কিছুই মানে না তার আভাস আছে তাদের সংলাপে "ওরা না মানে আল্লা, না মানে দ্যেবতা।" (পৃ. ২৪৪) হিন্দুরা যে ধর্ম মানে, বিশ্বাস করে, যে সংস্কার অন্তরে,যাপনে লালন করে, প্রতি মুহূর্তে এই নব্যসম্প্রদায় তা ধ্বংস করে দিতে চায়। কালীনাথ বাবাজীর উদ্দেশে বলেছে, "বল তো ও বৈষ্ণব শালাকে ধরে এনে একটু ফাউল কাটলেট কি মটন চপ খাইয়ে দি।'"(পৃ. ২৪৫) বাস্তবেও দেখা যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে পার্শবর্তী ব্রাহ্মণ শম্ভু চন্দ্র ও ভৈরব চন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে গো- হাড় নিক্ষেপের বিখ্যাত ঘটনা ঘটে। কালীনাথ হলেন সেই প্রতিনিধি যিনি রিফরমেশনের নামে এরূপ আচরণ করে থাকেন। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের দৃশ্যপট 'সভা' তথা জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা। একমাত্র সভার সভ্যগণই এখানে উপস্থিত হয়েছে। এই সভার কার্যকলাপ সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে। সভার সভাপতি নববাবু। আর সদস্য হলেন কালীবাবু, চৈতন, বলাই, মহেশ, শিবু প্রমুখ। এছাড়া রয়েছে পয়োধরী, নিতম্বিনী, খানসামা, বেয়ারা, যন্ত্রীগণ। সোশ্যাল রিফরমেশনের কথা উঠে আসে নববাবুর ভাষণে। নারীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ, জ্ঞানের বিস্তারের মাধ্যমে সংস্কার মুক্তির কথা বলা হয়। যদিও সভ্যগণের একে অপরের প্রতি অবিশ্বাস রয়েছে। সভার মুখ্য উদ্দেশ্য মদ্যপান এবং বারবিলাসিনীর সান্নিধ্য। তাই সভাপতির ভাষণের আগে ও পরে এহেন উল্লাসের প্রসঙ্গ তাদের অবস্থানকে স্পষ্ট করে। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে মধুসূদন আমাদের অন্তঃপুরের দৃশ্য দেখিয়েছেন। 'নবকুমারবাবুর শয়নমন্দির' এ প্রসন্নময়ী, নৃত্যকালী, কমলা, হরকামিনী, গৃহিণী এবং পরে নববাবু, বৈদ্যনাথ, কর্তামহাশয়ের দেখা মেলে। নারী চরিত্রগুলো তাস খেলায় মত্ত। তবে গৃহিণীর লোকচক্ষুর

অন্তরালেই চলে তাদের এখেলা। নববাবু জ্ঞানতরঙ্গিণীসভা থেকে ফিরে এসে সাহেবদের মতো বোনের গালে চুমু খেয়েছে। তাদের কাছে সভ্যতার নতুনরূপ ধরা পড়ে। নববাবু মদ্যপান করে ফিরে এসে অসংলগ্ন আচরণ করে। তাদের স্ত্রী'র জীবনে দুর্দশা নেমে আসে। তাই হরকামিনীর কথায় সভ্যতার একটা সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

৩০১.৩.৯.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনের ভাববস্তু বিশ্লেষণ কবে. নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

একক - ১০

প্রহসন রূপে 'একেই কি বলে সভ্যতা'?

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.৩.১০.১ : প্রহসন রূপে 'একেই কি বলে সভ্যতা'?

৩০১.৩.১০.২ : সমাজবাস্তবতা

৩০১.৩.১০.৩ : জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা

৩০১.৩.১০.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০১.৩.১০.১ : প্রহসন রূপে 'একেই কি বলে সভ্যতা?'

বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে প্রহসন ধারার উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় বঙ্গীয় লোকজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত 'যাত্রা' ধরনের নাট্যপালার সঙ্গে এর যোগ রয়েছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে মধুসূদনের যোগ থাকলেও দেশীয় ঐতিহ্যকে তিনি অস্বীকার করেননি। বাংলার যাত্রাপালার সঙ্গে সমান্তরালভাবে বয়ে এসেছে যে লোকনাট্যিক রূপ তারই পরিবর্ধিত, পরিবর্তিত সংস্করণ প্রহসন। সমসাময়িক সমাজব্যবস্থা বনাম ঘটমান ঘটনাবলীর ঘর্ষণজাত যে সামাজিক ও মানসিক সংঘর্ষ—প্রহসনগুলি রচনার মূল উৎস। যোগীন্দ্রনাথ বসু মন্তব্য করেন-"প্রহসন সামাজিক উপপ্লবের ও অশান্তির নিদর্শন। যখনই কোন সমাজ কোন বিরুদ্ধাচারের প্রাবল্যে উৎপীড়িত হয়, তখনই তাহাতে প্রহসন বা ব্যঙ্গাত্মক গ্রন্থের আর্বিভাব হইয়া থাকে।" (মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, অশোক পুস্তকালয়, পৃ. ২৩২) অর্থাৎ প্রহসনের মূল উৎস 'সামাজিক উপপ্লব ও অশান্তি।' 'একেই কি বলে সভ্যতা?'র আখ্যাপত্রে মধুসূদন একে 'প্রহসন' বলেছেন এবং বন্ধু-বান্ধবের কাছে ইংরেজি পত্রে 'চ্খন্ত্বত্র' শব্দটি প্রতিশব্দরূপে প্রয়োগ করেছেন। কেউ বলেন, ফ্রান্সেই সম্ভবত 'Farce'-এর উদ্ভব ঘটেছিল। কারণ ল্যাটিন 'Farcire' (যার অর্থ to staff) শব্দটি ফরাসি ভাষায় চ্খন্ত্বত্র রূপেই প্রচলিত ছিল। গ্রাম্য ল্যাটিন ভাষায় বলা হত Farsa। মূলতঃ Farce ছিল এক ধরনের প্রস্তুতিবিহীন (Impromptu) নাটক, যা গুরুগম্ভীর কোনো নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে গুঁজে দেওয়া হত। পরবর্তীতে হৈ চৈ গন্ডগোলে পূর্ণ উদ্দামতাময় Comic action রূপে ব্যবহৃত হয়। Farce এর মূল লক্ষ্য ছিল—বাহ্যিক দৃশ্য ঘটনা দ্বারা মানুষকে বাহ্যিক ভাবে হাসানো। ষোড়শ শতকে ইংল্যান্ডে কোনো গুরুগম্ভীর বিষয়ের নাটকের মধ্যে কোনো Farcical episode প্রবেশ করিয়ে দেওয়া অর্থে প্রহসন ব্যবহৃত হয়। 'কমনওয়েলথ পিরিয়ড' এ প্রহসন After Piece রূপে অভিনীত হতে থাকে। এই After piece নাটকের চাহিদা বৃদ্ধির পরই ইংরেজি নাট্যধারায় প্রহসনের নিজস্ব স্বতন্ত্র প্রয়োগ ঘটল। রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে এর রচনারীতিতেও

পরিবর্তন এল।

সামাজিক পটভূমিকাকে বিষয় হিসাবে নির্বাচন, সমাজের নানান অসঙ্গতি, বিশৃঙ্খলা প্রদর্শন, রঙ্গ-কৌতুক- ব্যঙ্গ- উপহাসের অনুকৃতি, কখনো স্বাধীনভাবে, কখনো অন্য কোনো নাটকের সঙ্গে অভিনীত হওয়া—প্রহসনের সাধারণ বৈশিষ্ট। চরিত্রশোধন, নৈতিক দিক সবসময় না থাকলেও দোষ প্রদর্শন করেই হয়তো নাট্যকার সংশোধনের দিকটি উহ্য রেখে যান। আকারে ক্ষুদ্রতা প্রহসনের একটি বৈশিষ্ট্য। রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—"সমাজ প্রচলিত কোন দোষের সবিস্তার বর্ণন। সেই দোষ জন্য অনিষ্ট সংঘটন ও তৎপরে তদ্দোষাক্রান্ত ব্যক্তির অনুতাপ ও চরিত্র শোধন প্রভৃতি পরিহাসচ্ছলে বর্ণন করিয়া সেই দোষের প্রতি সমাজের ঘৃণা উৎপাদন করাই, বোধহয় প্রহসনের মুখ্য উদ্দেশ্য।" (পৃ. ২৩৩) দীনবন্ধু মিত্র প্রহসনের সমার্থক শব্দ হিসেবে 'সমাজচিত্র' ব্যবহার করেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'সামাজিক নকসা', 'পঞ্চরং' শব্দ ব্যবহার করেন। তাই প্রহসন কখনো বিদ্রুপ প্রধান, কখনো নিছক রঙ্গ-কৌতুক, কোথাও শোধন অর্থে ব্যবহৃত। প্রহসনে চরিত্র অপেক্ষা ঘটনা ও পরিস্থিতি বড়ো। চরিত্রগুলি অন্তর্মুখী নয়, বহির্মুখী। Extrovert বা বহির্মুখী হবার জন্যই চরিত্রগুলি টাইপ চরিত্র বা কাছাকাছি হয়ে যায়। এধরনের চরিত্র জোড়ায় জোড়ায় থাকে— Binary Combination সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য।

'একেই কি বলে সভ্যতা?' After piece রূপে রচিত। পরিসর তথা আয়তনিক দিক দিয়ে বলা যায়, মাত্র দুটি অঙ্কে এবং চারটি গর্ভাঙ্কে কাহিনি বিন্যস্ত হয়ে প্রহসনের প্রাচীন ভারতীয় আদর্শকে মান্যতা দিয়েছে। নববাবু— কালীবাবুকে 'ধৃষ্ট' বললে তাদের কার্যকলাপকে এই প্রহসনের মূল দিক বলা যায়। কারো দোষত্রুটি অসঙ্গতিকে তুলে ধরে তাকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করা এবং শেষে শোধন করা প্রহসনের লক্ষ্য হলে ইয়ং-বেঙ্গল গোষ্ঠীর দোষ প্রদর্শন এবং হরকামিনীর উক্তির মধ্যে ("মদ মাস খ্যেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়?-একেই কি বলে সভ্যতা?') (মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ২৫১) শোধনের কথা না থাকলেও আদর্শের উল্লেখ আছে। প্রহসনে অতিহাস্য ও পরিহাস থাকে। চরিত্রের আচরণ, পরিস্থিতি ও সংলাপে অতিহাস্য ও পরিহাস প্রসঙ্গ এসেছে। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সিকদার পাড়া স্ট্রিটের কিছু অংশ, যথা বাবাজীর ভূমিকা, সার্জেন্ট চৌকিদারের প্রসঙ্গ, 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র কাজকর্মের মধ্যে Comic Action মেলে। এতে আছে অতিশয়োক্তি অতিরঞ্জনজাত বিচিত্র কর্মকান্ড। যথা হরকামিনীর কথায়—"সেদিন বাবু জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা থেকে ফিরে এসে ঠাকুরঝিকে দেখেই অমনি করে ওর গালে একটি চুমো খেলেন।" (তদেব, পৃ. ২৪৯) পিতা বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে প্রতারণা (কালীবাবুর মিথ্যা পরিচয় জ্ঞাপন), কোনো গভীর বিষয়ের আলোচনা-সমস্যার কথা উঠলেই তৎক্ষণাৎ মদ্যপান করে পিপাসা নিবারণের চেষ্টা, গণিকালয়ে দেশোদ্ধারের পবিত্র কর্মের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ এবং দেশোদ্ধারকে পান ভোজনের সঙ্গে সমীকৃত করা—প্রহসনের উদ্দেশ্যকেই স্পষ্ট করে।

প্রহসনের আদর্শ অনুসরণেই এতে পূর্ণাবয়ব এবং পরিপাটী কোনো কাহিনি নেই। সুকুমার সেন তা স্বীকার করেছেন। যেটুকু আছে সেটুকুও বিচ্ছিন্ন। চারটি ভিন্ন দৃশ্যপটে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের উপস্থাপনায় কাহিনি বিন্যস্ত। চরিত্রগুলি সকলেই বহির্মুখী— Extrovert। নববাবু- কালীবাবু নকশাধর্মী ও টাইপ চরিত্র। কোনো চরিত্রের বিশ্লেষণও বিবর্তন নেই। তাসখেলায় যে হরকামিনী নিস্ক্রিয় ভুমিকা গ্রহণ করে নিরন্তর 'পাস' দিয়ে যায়, কোন গোপন পথ ধরে যে তারই মর্ম থেকে আগ্নেয়গিরির অগ্নিধারা নিঃসৃত হল, সে

আকস্মিকতার শূন্যতা নাট্যকার ভরাট করেননি। প্রহসন বলেই হয়তো সে দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। যে নববাবু প্রথম গর্ভাঙ্কে কর্তামশায়ের শাসন ও ব্যক্তিত্বে নিষ্প্রভ ছিল, 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র সভাপতি হয়েও 'অ্যাটেন্ড' দিতে যে দ্বিধাগ্রস্থ, বিশেষ 'দ্রব্যগুণে' তার মধ্যে আকস্মিক অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন বিনা ভূমিকায়, প্রহসন বলেই এসে পড়েছে। কালীনাথকে 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'য় এক ঝলক মাত্র দেখা গেছে। সভায় সে নিষ্ক্রিয়, শ্রীমতি নিতম্বিনীর 'সফট' হাতের 'ফেভর' নিয়ে সে বিদায় নিয়েছে; কিন্তু নববাবুকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসার জন্য যার এত সক্রিয়তা, সভায় সে নিষ্ক্রিয় কেন—প্রহসন বলেই তা সম্ভবপর হয়েছে। সিকদার পাড়া স্ট্রিটে বিচিত্র মানুষের চিত্র—চরিত্র পরপর মিছিলের মতো এসে ক্ষণেকের মধ্যেই উধাও হয়ে গেছে। কারো সঙ্গে কারো যোগ বা সম্পর্ক নেই। যেন নিষিদ্ধ পল্লীর সান্ধ্যচিত্রের ফটোগ্রাফিক প্রতিবেদন নাট্যকার উপহার দিয়েছেন রসিকতা তথা হাস্যরস যোগান দিতে। আন্তর ব্যঞ্জনায়ও প্রহসনের বৈশিষ্ট্যকে দ্যোতিত করে। তাই পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে এবং দেশীয় ঐতিহ্য অনুসারে 'একেই কি বলে সভ্যতা?' কে প্রহসন হিসাবে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

৩০১.৩.১০.২ : সমাজবাস্তবতা

প্রহসনের একটি বৈশিষ্ট্যই হল সমকালীন সমাজবাস্তবতাকে বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনের পরিবেশ ও পটভূমি সমকালীন কলকাতার প্রত্যক্ষ ও বাস্তব পরিবেশ। রামমোহনের বিলেত থেকে কলকাতায় আগমনের পর থেকে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ পর্যন্ত যে পরিবর্তিত বাঙালি সমাজ কলকাতাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে তারই প্রকাশ ঘটেছে এই প্রহসনে। কলকাতার এই বাস্তব পরিবেশটি দুইভাবে প্রহসনে প্রতিফলিত হয়েছে—সিকদার পাড়া স্ট্রীটের খন্ড খন্ড দৃশ্যের মাধ্যমে এবং 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'য় নবকুমারের উক্তিতে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে কালীনাথের উক্তিতে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য মেলে। সেই উক্তির কিছু কিছু দিক এখনও কলকাতায় লক্ষণীয়। নাট্যকারের লক্ষ্য এই প্রত্যক্ষ সমাজ পরিবেশ, যা সমকালীন হয়েও চিরকালীন।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে নববাবু 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'য় সভাপতি হিসাবে যে ভাষণ দিয়েছে তাতে সমকালীন বাস্তবতার অনেকগুলো বিষয়ই উঠে এসেছে। যথা—বিদ্যাবলে সুপারস্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রি হওয়া, পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে অস্বীকার করা, দেশের সোস্যাল রিফরমেশনের চেষ্টা করা, মেয়েদের এডুকেট করা, মেয়েদের স্বাধীনতা দেওয়া, জাতিভেদ তফাত করা, বিধবাদের বিবাহ দেওয়া, পরাধীন ভারতবর্ষ আজ জেলখানা, তার লিবারটির জন্য চেষ্টা করা। উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ ভাবনাগুলোর সবই এখানে উপস্থিত। 'সুপরস্টিসনের শিকলি' কাটা এবং পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধতার মধ্যে রামমোহন রায়ের প্রভাব থাকতে পারে। রামমোহন রায় 'একেশ্বরবাদ'এবং নিরাকার ব্রহ্মার উপাসনার কথা বলেন। সোস্যাল রিফরমেশনের অন্যতম দিক ছিল মেয়েদের শিক্ষিত করা, মেয়েদের স্বাধীনতা দেওয়া। রামমোহন, উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক, বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, বেথুন সাহেব প্রমুখের প্রচেষ্টায় মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, নারীশিক্ষা প্রসার, নারী স্বাধীনতার মতো বিষয়গুলো প্রাধান্য পাচ্ছিল। বিধবাদের বিবাহ দেওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন বিদ্যাসাগর। সে বিষয়ে তিনি গ্রন্থও রচনা করেন 'বিধবাবিবাহ চলিত হওয়া উচিৎ কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'। বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত তা প্রমাণ করেন তিনি। ইয়ং বেঙ্গল দল এই

বিধবাবিবাহকে সমর্থন করত। নববাবুর মা, দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে গৃহিণী চরিত্র কোনো সভার কথা বলেছেন, সেটি রামমোহনের আত্মীয় সভা (১৮১৫) কিংবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ববোধনী সভা' (১৮৩৯) হতে পারে। আর ভারতবর্ষ পরাধীন থাকার কারণ হিন্দু- মুসলিম দ্বিজাতিতত্ত্ব। ব্রিটিশ দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ বপন করে রেখেছে। নববাবুর ভাষণে তার ইঙ্গিত আছে।

নববাবু এবং কালীবাবু বঙ্গীয় নব্যযুবক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। তবে নববাবু ও কালীনাথ দুজনের আচরণেরও সত্তার পার্থক্য আছে। নববাবু জ্ঞান-বিদ্যাচর্চার নিরিখে ডিরোজিওপন্থী। কিন্তু যারা পাশ্চাত্য আদর্শকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারেনি, দেশীয় ঐতিহ্যও তাদের অনায়ত্ব—তাদেরই প্রতিনিধি কালীনাথ। সে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এবং 'শ্রীমদ্ভাগবত গীতা'র মাহাত্ম্য জানেনা, এমনকি সঠিক উচ্চারণও করতে জানেনা। বারাঙ্গণা সান্নিধ্য, মদ্যপান, অপসংস্কৃতি কালীনাথদের বিশেষত্ব। বাড়ির বড়দের প্রতি অশ্রদ্ধা, অসম্মান পর্যন্ত করতে দেখা গেছে—"এ বুড়ো বেটা কি অকালের বাদল হয়ে আমাদের প্লেজর নষ্ট কত্যে এল?" (পৃ. ২৩৯) কর্তামশায় এই বখে যাওয়া যুবকদের জানেন। তাই তাদের প্রতি সন্দেহ পদে পদে। তাদের গন্তব্য কোথায়, তারা ধর্মশাস্ত্র জানে কিনা সবকিছু যাচাই করে নিতে চায়। কর্তামশায়ের মতো মানুষেরা ধর্মভীরু। ধর্মের কষ্টিপাথরে সবকিছু যাচাই করতে চান। কালীনাথ বলেছে-"আজ্ঞে আমাদের কালেজে থেকে কেবল ইংরাজী চর্চা হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃতবিদ্যা আলোচনার জন্য সংস্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্মশাস্ত্রের আন্দোলন করি।" সমকালে ইংরেজির পাশাপাশি সংস্কৃত চর্চা সংস্কৃত কলেজ এবং নানা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমান্তরাল ভাবেই চলছিল। আর ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা তো আত্মীয়সভা, তত্ত্ববোধিনী সভা, ব্রাহ্মসভা ইত্যাদির মাধ্যমে চর্চিত হচ্ছিল।

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সিকদার পাড়া স্ট্রীটে অন্যতর সমাজ বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করি। বৈষ্ণব বাবাজীকে কেন্দ্র করে হাসি তামাশায় মেতে উঠেছে মাতাল, বারবিলাসিনী, সারজন, চৌকিদার, কালীনাথও। অধার্মিকের কাছে ধার্মিক মানুষ লাঞ্ছিত, অপমানিত। ধর্মরক্ষার জন্য ঘুষ পর্যন্ত দিতে হয়েছে। আর বাবাজীর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে এই অধঃপতিত অবস্থা। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সমকালীন সমাজের ভিন্নতর আর এক রূপ প্রত্যক্ষ করি। প্রসন্নময়ী, নৃত্যকালী, কমলা, হরকামিনী অন্তঃপুরের মেয়ে তাস খেলায় ব্যস্ত। এই তাস খেলায় তাদের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হরকামিনীর কথা থেকে জানা যায়, 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা' থেকে ফিরে এসে নবকুমার তার বোন প্রসন্নর গালে চুমু খেয়েছে, একেবারে সাহেবদের কায়দায়। বাঙালি ঘরের মেয়েরা এই আদব কায়দায় একেবারেই প্রস্তুত নয়। নববাবু সভা থেকে আকণ্ঠ মদ্যপান এবং বারবিলাসিনীর সঙ্গ লাভ করে বাড়ি ফিরলে কী পরিণতি হয়েছে— তার বিবরণ আছে। বাড়ির বয়স্ক পরিচারক বৈদ্যনাথকে সে রিফরম করতে চায়। বাড়ির কর্তামশায়ের প্রতিও তার অশালীন সংলাপ শুনতে পেয়েছি। বাবাকে 'ওলড ফুল' বলেছে। বাবার মৃত্যুর পর নববাবু স্বাধীনভাবে যা খুশি তাই আচরণ করবে। সন্তানের অসংলগ্ন আচরণ দেখে নববাবুর মা তথা গৃহিণী বলেছে-"আমার দুধের বাছাকে কি কেউ বিষ টিষ খাইয়ে দিয়েছে না কি?" (পৃ. ২৫১) গৃহিণীর সন্তানের প্রতি অপত্য স্নেহ ধরা পড়েছে। কিন্তু কর্তামশায় তথা নববাবুর বাবার সংলাপে তৎকালীন কলকাতার আসল রূপধরা পড়েছে-"কলকাতা মহাপাপ নগর—কলির রাজধানী, এখানে কি কোন ভদ্রলোকের বসত করা উচিৎ?" (পৃ. ২৫১) তাই সপরিবারে বৃন্দাবন যাত্রার পরিকল্পনা। নববাবুর এই আচরণ দেখেই গৃহস্থ বধুর অসহায়

অবস্থার চিত্র স্পষ্ট হয়। হরকামিনীর কথাতে তা স্পষ্ট—"হায়, এই কলকেতায় যে আজকাল কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে তার সীমা নাই।" (২৫১) তার পর্যবেক্ষণীতে ধরা পড়ে, আজকাল কলকাতায় যারা লেখাপড়া শেখে তাদের এই জ্ঞানটিই ভালো জন্মে। আক্ষেপের সঙ্গে বলেন এমন স্বামী থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কি। সভ্যতার সুন্দর একটি সংজ্ঞার্থ ব্যঙ্গচ্ছলে হরকামিনীর সংলাপে উঠে এসেছে—"বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সায়েবদের মতন সভ্য হয়েছি। হা আমার পোড়া কপাল! মদ মাস খ্যেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়?—একেই কি বলে সভ্যতা?" (পৃ. ২৫১) শুধু বাস্তব সমাজচিত্রই নয়, প্রহসনের নামকরণকেও সার্থক করে তোলে হরকামিনীর এই কাকুবক্রোক্তি অলংকারের আশ্রয়ে বলা উক্তি। সমাজের এক ধ্বস্ত রূপের পরিচয় ফুটে ওঠে এই প্রহসনে।

৩০১.৩.১০.৩ : জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা:

১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ডিরোজিও তাঁর ঘনিষ্ঠ ছাত্রবন্ধুদের নিয়ে গঠন করলেন 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েসন'।এই সভায় আলোচিত হয় সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় বিষয়সমূহ। খোলামনে যুক্তিপূর্ণ ভাবে বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচিত হয়। হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্ররা তাঁদের নবলব্ধ জ্ঞান এখানে প্রয়োগের সুযোগ পেতেন। পাক্ষিক এই সভার সভাপতি ছিলেন ডিরোজিও, সম্পাদক উমাচরণ বসু। সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, সমাজ—সবকিছু নিয়ে আলোচনা হলেও আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল হিন্দুধর্ম ও তার গোঁড়ামি। ১৮৩০-এ এই অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েসনের আদর্শে সাতটি সভার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। পরবর্তীতে রামমোহনের 'আত্মীয় সভা', হিন্দু আচার-আচরণকে সমর্থনের মনোভাব নিয়ে প্রতিষ্ঠিত 'ধর্মসভা' বাস্তবক্ষেত্রেই দেখা যায়। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা' তারই প্রসারিত রূপ। পরবর্তীতেও নাটকে বিভিন্ন ধরনের নিবারণী সভার উল্লেখ পেয়েছি।

'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'টি সভার সভ্যগণের বহুশ্রমের ফসল। কালীনাথের কথায়—"যখন আমাদের সবস্ক্রিপসন লিস্ট অতি পুয়র ছিল, তখন আমরা নিজে থেকে টাকা দিয়ে সভাটি সেভ করেছিলাম।" পৃ. ২৩৯, প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কগ্ন সভা আয়োজনের বিষয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে কর্তামশায়ের বৃন্দাবন থেকে ফিরে আসায়। সিকদার পাড়া স্ট্রিটে সভায় গিয়ে সভা করার অনুমোদন কর্তামশায় দেবেন না।তা সত্ত্বেও কর্তামশায়কে বুঝিয়ে সভায় যাবার অনুমোদন মেলে। অনুমোদনকরলেও সন্দেহবশত বাবাজীকে তাদের খোঁজখবর নেবার জন্য পাঠানো হয়। বাবাজীর অভিজ্ঞতা একেবারেই সুখকর ছিলনা। নববাবুদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে একটা আভাস তিনি পেয়েছেন। বেশ্যাপল্লীতেই এই সভার অবস্থান। বাবাজী বারবিলাসিনী, মদ্যপ, সারজনের মুখোমুখি হয়ে তার সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়েছেন। প্রহসনে দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে 'সভা' নামাঙ্কিত অংশে 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র কার্যকলাপ সম্পর্কে ধারণা পাবো।

আখ্যানের ধারাটি লক্ষ করলে দেখা যায়, নববাবুর বাড়ি থেকে নব-কালীনাথের রওনা হওয়া, পথে চলা, বাবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং অবশেষে সভাস্থলে পৌঁছানো খুব দ্রুত ঘটে গেছে ঘটনাগুলো। তখন সভায় উপস্থিত বলাই, চৈতন, শিবু, মহেশ। এদের শিল্প সংস্কৃতি উচ্চস্তরের নয়। অক্ষম ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, হীনমন্যতাবোধ "হ্যাঁ হ্যাঁ সকলেরই বিদ্যা জানা আছে", পৃ. ২৪৫ প্রভৃতি মনোভাব দ্বারা এরা চালিত। এদের মূল কাজ মোসাহেবি করা, যা তখনকার বাবু সংস্কৃতিরই অপরিহার্য অঙ্গ। এই চারজনের মধ্যে শিবু

ও চৈতন একদিকে, বলাই ও মহেশ বিপরীত ধারার। তারা কালীনাথ নববাবুর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও গুণমানের মূল্যায়ন করেছে। সর্বসম্মতিক্রমে চৈতন সেদিনকার সভায় সভাপতি নির্বাচিত হল। তাকে সভাপতি নির্বাচিত করার কারণ, চৈতন' কালবৈগুণ্যের মধ্যে 'অচৈতন্য' স্বরূপ, কালবৈগুণ্যেই মানুষের চৈতন্য হারিয়েছে। সভাপতিরূপে চৈতন্যের প্রথম কাজ হল-"খানসামা-বেয়ারা-গোটাদুই ব্রান্ডি আর তামাক নে আয়।" [পৃ. ২৪৬] —এই আদেশ করা। তারপর পয়োধরী, নিতম্বিনী, যন্ত্রীগণের প্রবেশ ঘটে। চৈতন পয়োধরীকে তার দিকে সরে আসতে বললে পয়োধরী সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। নারীরূপা গণিকাও এদের সঙ্গ চায়না। এতই এরা ঘৃণ্য। পয়োধরীর কণ্ঠে গান পরিবেশিত হয় শঙ্করা রাগিণী এবং খেমটা তালে।গানের ভাষায় নারীর অসহায় অবস্থাই চিত্রিত হয়—

"এখন কি আর নাগর তোমার/আমার প্রতি, তেমন আছে,
নূতন পেয়ে পুরাতনে/তোমার সে যতন গিয়েছে।।
...এখন ওহে গুণনিধি,/আমায় বিধি বাম হয়েছে।"

পয়োধরীর এই গানের ভাষায় প্রকাশিত অস্তিত্ব সংকট হরকামিনীর কণ্ঠেও বর্ষিত হয়েছে, 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের শর্মিষ্ঠার কণ্ঠেও। পয়োধরী হয়ে যান চিরকালীন নারী, মধুসূদনের সমবেদনা বর্ষিত হয়েছে তাদের প্রতি। পয়োধরীর গান সভারসুর কেটে দিয়েছে। একদিকে পয়োধরীর প্রত্যাখ্যান বাক্য অন্যদিকে মহেশ এর 'হাই' তোলা, বলাইএর 'সাকির' ভূমিকা ঠিকমতো পালন না করার ঘটনায় তা বোঝা যায়।

এই সভার পরবর্তী পর্ব শুরু হচ্ছে নববাবুর সভাপতিত্ব গ্রহণের মধ্যদিয়ে। চেতনপর্ব উপলক্ষমাত্র, নববাবুপর্বই নাট্যকারের লক্ষ্য। নববাবু ও কালীবাবু সভায় প্রবেশ করল। সকলে গাত্রোত্থান করে স্বাগত জানাল স্থায়ী সভাপতিকে। কালীনাথের সক্রিয়তার পর্ব শুরু হল,চৈতনের সভাপতিত্বে শুধু পান-ভোজন-নৃত্য-গীতের আয়োজন ছিল। তখনকার কলকাতার সমসাময়িক জীবন ও সমাজ সম্পর্কে চৈতনের কোনো চেতনা ধরা পড়েনি। তা পড়েছে নববাবুর ভাষণের মধ্যে। তার ভাষণের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিই তখনকার কলকাতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতের ইতিহাস। ভাষণের মূলকথাগুলো তুলে ধরা যেতে পারে—

- জেন্টেলম্যেন, আপনারা সকলে এই দেওয়ালের প্রতি একবার চেয়ে দেখুন; এই যে কয়েকটি অক্ষর দেখছেন, এই সকল একত্র করে পড়লে "জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা" পাওয়া যায়।
- এই সভার নাম 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'—আমরা সকলে এর মেম্বর—আমরা এখানে মিট করি যাতে জ্ঞান জন্মে-এন্ড উই আর জলি গুড ফেলোজ।
- আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপারস্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রি হয়েছি; আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েছে; এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে, এ দেশের সোসীয়াল রিফরমেশন যাতে হয় তার চেষ্টা কর।
- জেন্টেলম্যেন, তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর—তাদের স্বাধীনতা দেও— জাতভেদ তফাৎ কর— আর বিধবাদের বিবাহ দেও— তা হলে এবং কেবল তা হলেই, আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলন্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে— নচেৎ নয়।
- এখন এ দেশ আমাদের পক্ষে এক মস্ত জেলখানা; এই গৃহ কেবল আমাদের লিবরটি হল অর্থাৎ

আমাদের স্বাধীনতার দালান, এখানে যার যা খুশি, সে তাই কর।

এই সভার সভ্যগণের মিলিত হবার কারণ জ্ঞানঅর্জন করা, সমকালীন সমাজ-ধর্ম-শিক্ষা-সংস্কার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। সমাজে যে কুসংস্কার আছে, তাদের কথায়, সেই সংস্কার মুক্ত হয়েছেন তারা। তাদের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হয়েছে। কথায় ও কাজে তার সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। মেয়েদের শিক্ষিত করতে হবে— জাতিভেদপ্রথা দূর করতে হবে। বিধবাদের বিবাহ দিতে হবে— তাহলে ভারতভূমি বিশ্বের সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে। কিন্তু এই উদ্দীপনাময় ভাষণের পর বৃহত্তর কর্মকান্ডের পরিকল্পনার পর স্বাধীনতার নামে মদ্যপান, পয়োধরী, নিতম্বিনীর হাত ধরা, মাথা আর মন এক করে কাজ করার প্রতিজ্ঞা থেকে সরে আসে। এই গর্ভাঙ্কের ফলশ্রুতি পরবর্তী গর্ভাঙ্কে পাবো। হরকামিনীর সংলাপে সভ্যতার, সভ্যের সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়েছে, নারীদের যন্ত্রণার কথা প্রকাশ পেয়েছে। এই 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার'র মূল্য আছে, কিন্তু সেখানে সত্যিকারের কী আলোচনা হয়, কোন সংস্কৃতিকে বহন করে তার পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে। গর্ভাঙ্কটি শেষ হয়েছে একটি Dramatic figure সৃষ্টি করে। নাট্যশিল্প হিসাবে তা লক্ষণীয়।

৩০১.৩.১০.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসন হিসেবে কতখানি সার্থক হয়েছে বলে তুমি মনে করো।

২। 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র নাট্য উপযোগিতা বিচার করো।

একক - ১১

সংলাপ

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.৩.১১.১ : সংলাপ

৩০১.৩.১১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০১.৩.১১.১ : সংলাপ

সংলাপ নাট্য চরিত্রের, চরিত্রের সঙ্গে পাঠক-দর্শকের যোগাযোগের মাধ্যম। সবাক নির্বাক দুইধরনের সংলাপই ব্যবহৃত হয়। সংলাপ রচিত হয় নাট্যচরিত্রের বৃত্তি, সামাজিক স্তর, নাটকীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী। "একেই কি বলে সভ্যতা?" প্রহসনের সংলাপের প্রধানতম দিক সমসাময়িক সমাজ জীবনের সঙ্গে নিজের গভীর ও প্রত্যক্ষ সংযোগের অভিজ্ঞতা। মধুসূদন বিভিন্ন স্থানের, বিভিন্ন বৃত্তির বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে সংযোগ থেকে এ ভাষা আয়ত্ত করেছেন। প্রহসনের এই সংলাপ আলোচনায় কয়েকটি বিশেষ দিকে আমরা নজর দেব—

- বিভিন্ন বৃত্তির মানুষের ভাষা—যথা: বার বিলাসিনী, সার্জেন্ট, চৌকিদার, মুটে প্রভৃতির ভাষা।
- বিশেষ ধর্মের অন্তর্গত ভাষা—বাবাজী (বৈষ্ণবধর্ম), দুজন মুটের (মুসলিম) ভাষা
- বিশেষ অবস্থার ভাষা—যথা: মাতালদের ভাষা।
- শিক্ষিত উচ্চবিত্তদের ভাষা—রক্ষণশীল এবং আধুনিক চরিত্রের ভাষা—কর্তামশায়, নবকুমার এবং তার বন্ধুবর্গের ভাষা।
- নারীর ভাষা

এছাড়া অন্যভাবেও ভাবা যেতে পারে—অন্তঃপুরের ভাষা, জ্ঞান তরঙ্গিণী সভার ভাষা, সর্দারপাড়া স্ট্রিটের ভাষা অর্থাৎ দৃশ্যপট অনুযায়ী, আবার চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সংলাপের ভাষাও পৃথক হতে পারে।

এভাবে বিন্যাসের পেছনে তিনটি মনোভাব বর্তমান-

এক. উপভাষা রূপে লক্ষ্য করা

দুই. সমাজ ভাষা তত্ত্বের দিক থেকে লক্ষ্য করা

তিন. নাটকের মূল ভাবনার কতখানি পরিপোষক হয়েছে বা তার নাট্য তাৎপর্য পর্যবেক্ষণ করা। আরেকটি দিক বলা যায়, মধুসূদন তখনকার উত্তর কলকাতার অধিবাসীদের মুখের উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখছেন, বানান তত্ত্বের দিক থেকে যা গুরুত্বপূর্ণ। নাট্য চরিত্রের ভাষাকে জীবন্ত রূপে প্রদর্শনের নাট্যিক দিকটিও লক্ষণীয়।

যাকে class dialect বলে, বিভিন্ন বৃত্তির মানুষের মুখের ভাষা তাই। বৃহত্তর শ্রেণীর সঙ্গে ভাব বিনিময়ে তাদের বৃত্তি ভাষার বিশেষত্বটি ধরা পড়ে। যেমন সার্জেন্ট ও চৌকিদার হিন্দি মিশ্রিত ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করেছে' হাল্লো! চওকিডার! এক আডমি ও ডার ডৌড়কে গিয়া নেই?' [পৃ: ২৪৩] সারজন অভারতীয় শাসক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তার গালাগালির মধ্যে শাসক সুলভ সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স ধরা পড়েছে। সার্জনের উচ্চারণে মূর্ধন্যী ভবনের বড় বেশি প্রাধান্য। যেমন—চওকিডার (চৌকিদার), আডমি (আদমি), ওডার (ওধার), আলবাট (আলবৎ), ডেকা (দেখা), টোম জলডী ডউড়কে (তোম জল দি দউড়কে), রাঢে কিসডে (রাধেকৃষ্ণ), ঠানেমে (থানেমে) ইত্যাদি। বার বিলাসিনীদের ভাষার নিজস্ব একটি ভঙ্গি আছে, সম্বোধনের ভাষায় নারী ভাষাব. আদলে ওলো, গা, লা ইত্যাদি ব্যবহার, ইডিয়মের ভাষায় আছে—কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করা, মুড়ো খেঙ্গরাদে বিষ ঝাড়া, নাকের জলে চোখের জলে করা, তুলসী বনের বাঘ ইত্যাদি। গণিকাদের ভাষার বিশেষত্বও ধরা পড়ে—'তোর যেমন পোড়া কপাল তাই ও হতভাগাকে রেখে চিস' (পৃ: ২৪২, ১/২) এইরাখা"র বিষয়টি লক্ষণীয়। মুটে দুজনের ভাষায় যশোহর অঞ্চলের উপভাষায় টান আছে-' দেখ মামু, এই হেঁদুবেটোরাই দুনিয়া দারির মজা করে ন্যেলে।' [পৃ ২৪৪, ১/২]

ধর্মের প্রভাবে সংলাপের ভাষার পরিবর্তন ঘটেছে। বাবাজী বৈষ্ণব বলেই তার কণ্ঠ থেকে বিভিন্ন সময় উচ্চারিত হয়েছে "জয় মহাপ্রভু", "রাধেকৃষ্ণ", "হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ" শব্দ, বাক্য। প্রথম মুটে ধর্ম প্রবণ মুসলমান বলেই মন্তব্য করেছে—'ও হারামখোর বেটার গো কি আর দিন আছে? ওরা নামানে আল্লা, নামানে দ্যেবতা।' [পৃ: ২৪৪] মুসলিম বলেই তার ভাষা ফারসি মিশেল। বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে ভাষার পরিবর্তন ঘটে। মাতালরা আকার ইঙ্গিতে পারিভাষিক অর্থে বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে। নাটকের সূচনায় কালীনাথ নবকুমারকে বলেছে 'ওহে নব, বলি কিছু আছে?' এই "কিছু" বলতে যে মদই, অন্য কিছু নয়, তা নবকে বলে দিতে হয় নি। গুরুজনদের কাছে মদের গন্ধ ঢাকার জন্য এরা পান খায়। কালীনাথ বলে—'আমি ভাই পানতো খেতে চাইনে, আমি পান কত্তে চাই।' নাটকের সমাপ্তিতে নব কুমার হরকামিনীকে "পয়োধরী" বলে সম্বোধন করে তার পায়ে পড়েছে, বোদেকে "রিফর্মড" করতে চেয়েছে, পিতাকে বলেছে "মদল্যাও" এবং কর্তামশায়ের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে বলেছে—'হিয়র, হিয়র, আইসেকেন্ড দি রেজোল্যুশন।' এ শুধু মাতালের উক্তি নয়, এর একটি পৃথক অর্থ আছে।

শিক্ষিত উচ্চবিত্তের পৃথক এক ভাষা বয়ান আছে। নব কুমার এর বাবা ত থা কর্তামশাইকে উচ্চবিত্ত শিক্ষিত রক্ষণশীল মনোভাবের প্রতীক বলা যায়। নবকুমার আরতার সম্প্রদায়ের মানুষকে আধুনিক মনোভাবাপন্ন বলতে হয়। এই দুই সম্প্রদায়ের মূল্যবোধ, নাটকে তাদের ভূমিকা আলাদা বলে সংলাপও ভিন্ন হয়েছে। পুত্র নবকুমার কর্তামশায়কে কলকাতার অকৃত্রিম বৈষ্ণব ভক্তরূপে নির্দেশ করেছে। কবি জয়দেব সম্পর্কে কর্তামশায়ের মন্তব্য—'আহা কবিকুল তিলক ভক্তিরস সাগর।' তিনি যে ভক্ত, এ ধরনের বিশেষণও আখ্যা প্রয়োগে তা ব্যক্ত হয়েছে। নব কুমার সম্পর্কে তার আশঙ্কা, কলকাতা শহর যে যুবকদের অধ:পতনের কেন্দ্র স্থল—তার সংলাপে তা স্পষ্ট হয়েছে। কালীনাথ ধূর্ত, দুশ্চরিত্র। নব বা অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে কথা বলার সময় যে শব্দ চয়ন করে, কর্তামশায়ের সঙ্গে মত বিনিময়ে ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে তা অনেকটাই মার্জিত, সংস্কৃত তৎসম ভাষা। নব'র সংলাপে মাঝে মাঝে ইংরেজি শব্দ এসেছে। ভাষণের সংলাপেও এই মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। নারীর মুখের ভাষাবয়নে নাট্যকার সচেতন থেকেছেন। নারীদের অসহায় ভবিষ্যতের রূপকল্প প্রকাশে নাট্যকার নারীরন্ট্রে' আমার ইচ্ছে করে যে গলায় দড়ি দে মরি', 'হা

আমার পোড়া কপাল', 'মদ মাস খেয়ে ঢলাঢলি করা' ইত্যাদি সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে। নারীর বিশেষত্ব ধরা পড়েছে "আরে মলো", "মর মর ছুড়ি", "ছি:" প্রভৃতি অব্যয় প্রয়োগে, সম্বোধন রূপে ওলো, লা, লো প্রভৃতি প্রয়োগে। গৃহিণীর স্নেহে অপত্য স্নেহ ব্যক্ত করতে বিশেষণ পদ—সোনার চাঁদ, দুধের বাছা ইত্যাদি প্রয়োগ।

এই প্রহসনের সংলাপের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য—নারী পুরুষ সকলের সমসাময়িক কালের মুখের জীবন্ত ভাষাকে সরাসরি নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লেখা, মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্প প্রাণতা, শব্দের দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ (উঠয়ে, শুখয়ে) অসমাপিকা সঙ্কোচন (নে গেলে, গলায় দড়িদে মরি) বাংলা ও ইংরেজি শব্দের সঙ্গে ইডিয়মের প্রয়োগ (to attend অর্থে এটেন্ড দেওয়া, to go the rounds অর্থে "রোঁদ ফেরা") প্রবাদকে ভাঙছেন কোথাও কোথাও। মধুসূদনের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত হয়েছে সংলাপে।

৩০১.৩.১১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে সংলাপ সৃষ্টিতে মধুসূদনের কৃতিত্ব বিচার করো।

একক - ১২

চরিত্র

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.৩.১২.১ : নবকুমার চরিত্র

৩০১.৩.১২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০১.৩.১২.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৩০১.৩.১২.১ : নবকুমার চরিত্র

প্রহসনের চরিত্র সৃষ্টিতে সূক্ষ্মতা ও গভীরতা না থাকলেও মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে যথেষ্ট সূক্ষ্মতা ও গভীরতার পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলির প্রতি নজর দেওয়া উচিত বলে মনে হয়, তা হল— চরিত্র পরিকল্পনায় লেখকের সচেতনতা, পরিকল্পনা, চরিত্রের মধ্যে সার্বজনীনতা চিরকালীন জীবনসত্য আছে কি না তা দেখা, চরিত্রের অন্তঃসঙ্গতি, দ্বন্দ্ব-বিবর্তন পরিণামের দিক দেখানো ইত্যাদি। প্রহসনে সাধারণত কেন্দ্রিয় চরিত্র থাকে না, থাকে শ্রেণিচরিত্র, টাইপ চরিত্র। তবে কেন্দ্রিয় চরিত্র বা নায়ক চরিত্র যদি কাউকে চিহ্নিত করতে হয় তবে নবকুমারকেই চিহ্নিত করতে হয়। প্রহসনে যে চারটি গর্ভাঙ্ক আছে, একমাত্র নবকুমারেরই চারটি গর্ভাঙ্কে উপস্থিতি লক্ষ্য করি। যতগুলি চরিত্র স্থান পেয়েছে প্রহসনে, একমাত্র নবকুমারের সঙ্গেই সকলের সংযুক্তি লক্ষ্য করি। প্রহসনের যে উদ্দেশ্যমূলকতা, সমাজবাস্তবতা-তারও প্রকাশবিন্দু নবকুমারই।

নবকুমার নামের দুটি দিক তাৎপর্যপূর্ণ—প্রথম দিকে নবকুমার নবযুগের নবশিক্ষিত যুবকগণের সে একজন, দ্বিতীয় দিকে আমরা দেখেছি, জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাগৃহে তার উচ্ছৃঙ্খলতার চরম ও চূড়ান্ত নিদর্শন প্রদর্শনের পর গৃহে এসে নিস্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং পিতার সাধু প্রস্তাবকে (সকলকে নিয়ে বৃন্দাবন যাত্রার প্রস্তাব) সমর্থন জানানোর মধ্যদিয়ে সে যথার্থই 'নবকুমার' হয়ে উঠল। নবকুমার চরিত্রের বিপরীত পৃষ্ঠে আছে তার বাবা তথা কর্তামশায়। কর্তামশায় একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ভক্ত, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও রক্ষণশীলতার প্রতীক তিনি। এই প্রাচীন রক্ষণশীলতার বিপরীতে আছে নবকুমার, নতুন সংস্কৃতির ধারক-বাহক। পিতা-পুত্র অতীত ও বর্তমানের প্রতিনিধি। বর্তমানের অসংযত, অসংলগ্ন আচরণের জন্যই অতীত যেন মুখ লুকালো—তাই কর্তামশায় বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে আবার বৃন্দাবনেই প্রস্থান করতে চাইলেন। নবকুমার চরিত্র আলোচনায় তাই যুগও পারিবারিক পটভূমি, একটি বিরুদ্ধতার পটভূমিকা স্থাপন করার আবশ্যকতা দেখা যায়।

নাটকের প্রথমদিকে নবকুমার ছিল নবকুমারের গৃহেই—বৈঠকখানায়, মাঝে পথে তথা সিকদার পাড়া স্ট্রিটে ও জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাগৃহে, আর শেষে নিজস্ব বাসগৃহে, শয়নকক্ষে, অন্তঃপুরে। এই কয়েক ঘন্টায় তিনটি ভিন্ন প্রতিবেশে নবকুমারের জীবন ও মানসের তিনটি ভিন্ন দিককে দেখানো হয়েছে। বৈঠকখানায় নবকুমার চরিত্রের নিরপেক্ষ তথা নিউট্রাল দিকটি ধরা পড়েছে। একেই তার চরিত্রের দ্বিধাতুর অবস্থা বলছি। সভায় এটেন্ড করা নিয়ে তার দ্বিধা, কালীনাথের মদ্যপান এবং বাবার উপস্থিতি নিয়ে দ্বিধা, কালীনাথ যে আত্মপরিচয় দেবে তা নিয়ে দ্বিধা কাজ করেছে। কালীনাথের ছলনা-প্রতারণা-ধৃষ্টতার সঙ্গে পিতার নিষ্ঠার কোনো সমতা বিধান তিনি করতে পারেননি। কিন্তু সেই কালীনাথেরই অদম্য উৎসাহ এবং সচেতন সক্রিয়তার ফলে অতি ধীরে তার মধ্যে একটি পরিবর্তন এল। নিজের পিতার সঙ্গে সে তখন ছলনা, প্রতারণা করে ফেলল। ওএটি নবকুমার চরিত্রের প্রাথমিক অবস্থার প্রথম Negation. বৈঠকখানায় যে পরিবর্তনের অস্ফুট সূচনা হল পথে তার বিবর্ধন হলেও প্রাথমিক অবস্থার রেশ তার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল। বাবাজীর প্রতি তার ও কালীনাথের বিপরীত আচরণই তার প্রমাণ। মূল্যবোধে তখনও সে আস্থাশীল। পিতার প্রতি শ্রদ্ধার কারণেই বাবাজীকে উৎকোচ দিয়ে সে বশীভূত করতে চায়—"বেটার হাতে কিছু ও কর্ম করে দিয়ে যদি মুখ বন্ধ কত্যে পারি"। (পৃ: ২৪৫)

যে পরিবর্তনের সূচনা নাট্যকার নবকুমারের মধ্যে করেছেন, কিছু সময়ের বিরতি না দিলে তা স্বাভাবিক হত না। এজন্য সভাগৃহে কালীনাথ ও নবকুমারের উপস্থিত হতে দেরি করানো হল। নবকুমারের এই পরিবর্তনকে একটি পরিণতস্তরে নিয়ে যাবার জন্য বিলম্বের প্রয়োজন ছিল। সভাগৃহে পৌঁছে 'লাইয়র—মিথ্যেবাদী'—প্রসঙ্গ নিয়ে তর্কের ঝড় ওঠে। নবকুমার যে নাট্যকারের প্রধান চরিত্র, মিথ্যাচার নবযুগেরই এক অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। যে মিথ্যাচারকে লক্ষ করেই নাটকের নামকরণ করা হয়েছে, এই তর্কে সেটাই দেখানো হয়েছে। এই নবযুগের অপর লক্ষণ চরিত্রের Extrovert দিক। আর তা প্রকাশে ঘর নয়, সমবেত মানুষের সভাগৃহই তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশস্থল। নিউট্রাল অবস্থা থেকে নবকুমার Extrovert হয়ে উঠল। সভাগৃহ নবকুমার চরিত্রের মধ্যবিন্দু ও Pivot। সভাগৃহে প্রবেশের আগে ও পরে তার চরিত্রের যে পরিবর্তন ঘটেছে, নাট্যকার তা পর্যবেক্ষণ করেছেন। সভাগৃহে নবকুমারের অসংযমী সত্তার চূড়ান্ত বিকাশ হল। সভাগৃহেই তার গৃহের বেদনার শুরু হয়েছিল। পয়োধরীকে নবকুমার বলেছিল—"ও পয়োধরি, তুমি ভাই আমার আরম্ নেও। এসো, আমার হাত ধর।" (পৃ: ২৪৮) তখনই Extrovert নব Introvert হয়ে উঠছে। এ তার তৃতীয় মাত্রিক পরিবর্তন। বাইরে থেকে তার অন্তঃপুরে যাত্রা শুরু হল। অন্তঃপুরে গিয়েও পয়োধরীর প্রসঙ্গ এসেছে। তার ঘুম সেই Introvert দিকের সূচক। পিতার সাধু প্রস্তাবকে সে তখন সমর্থন করে—"হিয়র, হিয়র, আই সেকেণ্ড দি রেজোলুসন।" (পৃ: ২৫১) নাটকে এটিই তার শেষ সংলাপ। বাইরে সে প্রমত্ত হলেও অন্তরে তার মধ্যে নবতর আরেক নব জন্ম নিচ্ছে। এই অনতিস্ফুট বিবর্তনই তাকে ব্যক্তিচরিত্রে পরিণত করেছে।

নবকুমার যতক্ষণ Extrovert ছিল, ততক্ষণ সে যুগের প্রতিনিধি, তখন তার মধ্যে যুগের নির্বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটেছে। সে পর্যন্ত সে 'টাইপ' চরিত্র। কিন্তু তার পরেই সে যখন নিষ্ক্রিয় এবং Introvert হয়ে পড়ল, তখন থেকে তার মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষত্ব এবং চিরকালীন মানবস্বভাব সঞ্চারিত হল। কালীনাথের সঙ্গে যতক্ষণ সে জুটিবদ্ধ ছিল, সেটুকু তার টাইপগত দিক। বৈঠকখানা ও পথে কালীনাথ সক্রিয় চরিত্র। নবকুমার তার সঙ্গী। একক চরিত্র কখনই যুগের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনা। নবকুমারের অনুপস্থিতিতে

তার চরিত্রের অনেকগুলো দিক উঠে এসেছে। যথা—নবকুমারের দাম্পত্য জীবনের হাহাকার, বিচ্ছেদের ইঙ্গিত, সভাগৃহে পয়োধরীর গাওয়া গানের মাধ্যমে তাস খেলার প্রতীক সৃষ্টি করে। হরকামিনী স্বামীর উদ্দেশে তীব্র ভাষায় নিন্দা-গালি-তিরস্কার বর্ষণ করেছে। ঘুমের বেশে নিষ্ক্রিয় থেকে নব তা নিরুত্তরে শিরোধার্য করে নিয়েছে। প্রত্যক্ষ Action এর মাধ্যমে নয়, নব'র অনুপস্থিতিতে ও অজ্ঞান অবস্থায়, পরোক্ষভাবে, নাট্যকার তারমধ্যে এই চিরকালীন মানবিক দিককে দেখতে চাইতেন। নবকুমার আমাদের কাছে দুভাবে ধরা দিয়েছে—অর্ধাংশ তার আপন Action ও সংলাপে; বাকি অর্ধাংশ নাট্যকার কৃত পরোক্ষ আয়োজনে। বাইরে তাকে ভোগবাদী ও মদ্যপ করে তুলেছেন নাট্যকার, তিনি তার ভেতরে অন্য নবর অন্বেষণ করেছেন।

৩০১.৩.১২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। নবকুমার চরিত্রাঙ্কণে নাট্যকারের দক্ষতা বিচার করো।

২। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে সমকালীন সমাজবাস্তবতা কতটা প্রস্ফুটিত হয়েছে—প্রসঙ্গসহ ব্যাখ্যা করো।

৩০১.৩.১২.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ

২। বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, স্বপন বসু, পুস্তক বিপণি

৩। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত, শ্রী যোগীন্দ্রনাথ বসু

৪। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, রামগতি ন্যায়রত্ন।

পর্যায়গ্রন্থ - ৪

একক - ১৩

‘আলিবাবা’ নাটকের অভিনয়

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.৪.১৩.১ : প্রসঙ্গ -- ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

৩০১.৪.১৩.২ : ‘আলিবাবা’ নাটকের অভিনয়

৩০১.৪.১৩.৩ : ‘আলিবাবা’ নাটকের নামকরণ

৩০১.৪.১৩.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০১.৪.১৩.১ : প্রসঙ্গ – ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা যখন মধ্যগগনে, বঙ্গরঙ্গমঞ্চ যখন তাঁর দ্বারা শাসিত, তখন বাংলা নাটকের আঙিনায় আত্মপ্রকাশ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৩-১৯২৭)। গিরিশচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায় সমকালে জনপ্রিয় হয়ে ওঠার অবকাশ ক্ষীরোদপ্রসাদের ছিল কম। তবু পঞ্চাশটিরও বেশি নাটকের রচয়িতা ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রধানত দুজন দিকপাল নাট্যনির্দেশক এবং অভিনেতার হাত ধরে একসময় নাটক-নাট্যভিনয়ের জগতে তুঙ্গে পৌঁছেছিলেন। সেই দুজন নাট্যব্যক্তিত্ব হলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং শিশির ভাদুড়ি। যে নাটকগুলিসূত্রে এই জনপ্রিয়তা, সেগুলি হল ‘আলিবাবা’ (১৮৯৭), ‘আলমগীর’ (১৯২১) ‘নরনারায়ণ’ (১৯২৬)।

রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপনা ছেড়ে যিনি নাটককে ভালোবেসেই নাট্যরচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন, তিনি যে পঞ্চাশটিরও বেশি নাটক লিখবেন সেটিই স্বাভাবিক। সমকালীন রঙ্গমঞ্চ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বা দর্শকরুচির কাছে কখনো বিভ্রান্ত হয়ে, আবার কখনো বিভিন্ন চরিত্রাভিনেতার অনুরোধ রাখতে গিয়ে যে নাটকগুলি তিনি রচনা করেছেন তা মঞ্চসাফল্যের মুখ দেখেনি। তবু নাটককে যেহেতু তিনি জীবিকার বাহন করেছিলেন, তাই আমৃত্যু নাটক রচনায় ছিলেন নিরলস।

ক্ষীরোদপ্রসাদ ২৪ পরগনা জেলার খড়দহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১২ এপ্রিল ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে, ব্রাহ্মণ পরিবারে। পারিবারিক পদবী ছিল ভট্টাচার্য, ‘বিদ্যাবিনোদ’ তাঁর প্রাপ্ত উপাধি, বিদ্যাচর্চা ও নাটক রচনার সূত্রে। বিজ্ঞানের ছাত্র ক্ষীরোদপ্রসাদ তৎকালীন জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনসটিটিউশনস বর্তমানে যা স্কটিশচার্চ কলেজ, সেখানে রসায়নের অধ্যাপনা করেছেন ১৮৯২ থেকে ১৯০৩ পর্যন্ত সাহিত্যপাঠ

এবং সাহিত্যরচনার প্রতি তীব্র ঝোঁক থাকায় অধ্যাপনার জীবন তাঁকে স্বস্তি দেয়নি। শেষপর্যন্ত সাহিত্যিক হওয়ার এবং নাট্যকার রূপে যশলাভের তীব্র বাসনায় অধ্যাপনা বৃত্তি ছেড়ে দেন। বি. এ. পরীক্ষা দেবার তিন বছর আগেই তাঁর প্রথম সাহিত্যকীর্তি 'রাজনৈতিক সন্ন্যাসী' (১৮৮৫) প্রকাশিত হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই কবিতা লেখালেখির শুরু। পরিণত যৌবনে উপন্যাসও রচনা করেছেন, কিন্তু নাট্যকার রূপেই তাঁর সর্বাধিক স্বীকৃতি। আমরা আগেই জানিয়েছি, ছোট-বড়-মাঝারি সব মিলিয়ে তাঁর রচিত নাটকের সংখ্যা ৫০টিরও বেশি।

তাঁর রচিত নাটকগুলি সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, রঙ্গনাট্যে বিভাজিত ।

সামাজিক নাটক—ফুলশয্যা (১৮৯৪), প্রেমাঞ্জলি (১৮৯৬), প্রমোদরঞ্জন (১৮৯৮), কুমারী (১৮৯৯)

পৌরাণিক নাটক — সাবিত্রী (১৯০২), সপ্তম প্রতিমা (১৯০২), রঘুবীর (১৯০৩), বৃন্দাবন বিলাস (১৯০৩), বভ্রুবাহন, বিদুরথ (১৯২৩), রাধাকৃষ্ণ, নরনারায়ণ (১৯২৬), ভীষ্ম (১৯১৩), রামানুজ।

ঐতিহাসিক --- বঙ্গের প্রতাপাদিত্য (১৯০৩), আলমগীর (১৯২১), চাঁদবিবি, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, বাংলার মসনদ, নন্দকুমার, পদ্মিনী, রাজা অশোক, খাঁজাহান, বাদশাজাদী, গোলকুণ্ডা, বঙ্গে রাঠোর।

রঙ্গনাট্য — আলিবাবা (১৮৯৭), আলাদীন, আবু হোসেন ইত্যাদি।

ক্ষীরোদপ্রসাদ, রচিত নাটকগুলি সেই সময়ে স্টার, কোহিনূর, এমারেল্ড, ক্লাসিক, রয়াল বেঙ্গল, মিনার্ভা, অরোরা, মনোমোহন, কর্নওয়ালিস, আলফ্রেড (মিত্র থিয়েটার), নাট্যমন্দির প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে ১৮৯৫ থেকে ১৯২৬ - এর মধ্যে অভিনীত হয়েছিল।

বাঁকুড়া জেলার বিক্না গ্রামে ৪ জুলাই ১৯২৭-এ তাঁর মৃত্যু হয়।

৩০১.৪.১৩.২ : 'আলিবাবা' নাটকের অভিনয়

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ১৬ এপ্রিল এমারেল্ড থিয়েটার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে ক্লাসিক থিয়েটারের পথ চলা শুরু হয় অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অভিভাবকত্বে। ক্লাসিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট নাট্যনির্দেশক এবং নাট্যাভিনেতা, অমরেন্দ্রনাথ যথেষ্ট চিন্তাভাবনা, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করলেও মঞ্চে অভিনীত কোনো নাটকই তেমন জনপ্রিয় হচ্ছিল না। যার ফলে মঞ্চসাফল্যও আসছিল না এবং অর্থাগমও ঘটছিল না। বারবার নাটক পরিবর্তন করা সত্ত্বেও সাফল্য না আসায় শেষ পর্যন্ত তিনি রঙ্গরস এবং নাচ-গানের সম্মিলনে একটি নাটক মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেই সূত্রেই ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা'র সন্ধান তিনি পান এবং এই নাটকের মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে শুধু সাফল্য নয়, অর্থাগমও ঘটে প্রচুর। জনপ্রিয়তা পান নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ। জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছয় ক্লাসিক থিয়েটার, সমকালীন অন্যান্য রঙ্গালয়গুলির সাফল্যকে পিছনে ফেলে। একই সময়ে প্রমথনাথ দাস রচিত 'আলিবাবা' (১৮৯৭) মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছিলো। ক্লাসিক এবং মিনার্ভা দুই থিয়েটারে একই বিষয়ের নাটক অভিনীত হওয়ায় 'তীব্র' প্রতিযোগিতার মধ্যে দর্শক সমাগম ক্লাসিকে কম হচ্ছিলো। এ প্রসঙ্গে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের জীবনীকার রমাপতি দত্ত (হরীন্দ্রনাথ দত্ত) জানিয়েছেন — 'দ্বিতীয় রাত্রি হইতে বিক্রয় কমিয়া গিয়া তৃতীয় ও চতুর্থ রজনীতে দুইশত-আড়াইশত টাকায় গিয়া ঠেকিল। কিন্তু ক্রমে দর্শকগণ যখন বুঝিলেন যে, কোথাকার আলিবাবা-র অভিনয় শ্রেষ্ঠ তখন

হইতে আর দেখিতে হইল না। ক্লাসিকের বিক্রয় ক্রমাগত বাড়িতে বাড়িতে পাঁচশো, সাতশো, বারোশো, পনেরোশো, আঠারোশো শেষে বাইশশো পর্যন্ত গিয়া দাঁড়াইল, আর এদিকে মিনার্ভা থিয়েটার উঠিয়া (বন্ধ হয়ে গেল) শেষে ৩১ মার্চ ১৮৯৮ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল।' (রঙ্গালয়ে, অমরেন্দ্রনাথ পৃষ্ঠা ১৫৬-১৫৭)

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা' অমরেন্দ্রনাথ দত্তর নির্দেশনায়, নতুন ভাবনাচিন্তায় এবং সার্বিক অভিনয় -- নাচগান ইত্যাদির মাধ্যমে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসুর নৃত্য পরিকল্পনায় এবং আবদালার ভূমিকায় অভিনয় এবং নৃত্যপরিবেশন এই নাটকের জনপ্রিয়তার কারণ। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মর্জিনা ও আবদালার নাচ-গান এবং রঙ্গরস সমৃদ্ধ অভিনয় সংশ্লিষ্ট নাটকটির মুখ্য আকর্ষণ। মর্জিনার ভূমিকায় কুসুমকুমারীর নৃত্য এবং অভিনয় দর্শকচিত্তকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। আলিবাবার পুত্র হুসেনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ যদিও মূল কাহিনীতে এবং ইংরেজিতে অনুদিত কাহিনীতে (বাটন অনূদিত) হোসেনের অবস্থান ছিল কিছুটা পৃথক এবং স্বল্প। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ এই চরিত্রটিতে অভিনয় করবেন বলেই চরিত্রটির পরিচয়ের পরিবর্তন ঘটান এবং নাটকে তাঁর অবস্থানও দীর্ঘ হয়। হুসেনের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় দেখে দর্শক মুগ্ধ হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে অমরেন্দ্রনাথের জীবনীকার জানিয়েছেন, "আলিবাবা অভিনয় আজি পর্যন্ত সমস্ত থিয়েটারেই হইয়াছে। বহু অভিনেতা পুনরায় এই হুসেনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে — কিন্তু, অমরেন্দ্রনাথের মতো তেমনটি কাহারো হয় নাই। যাহারা অমরেন্দ্রনাথের হুসেনের ভূমিকায় অভিনয় দেখিয়াছেন এবং অভিনেতাদের ওই ভূমিকায় অভিনয় দেখিয়াছেন তাহারা নিশ্চই উপলব্ধি করিয়াছেন অমরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে ও সাত্ত্বিকতায় এক অদ্ভুত অভিনব, অননুকরনীয় ভাব উদ্ভাসিত।"

'আলিবাবা' নাটকটি এবং অভিনয়কে নিয়ে একটি বিতর্ক আছে। 'আলিবাবা' নাটকের সমকালেই 'আলিবাবা' নামক আর একটি নাটকের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর রচয়িতা রূপে প্রমথনাথ দাসের নাম পাওয়া যায়। প্রমথনাথ দাসের রচিত 'আলিবাবা' মিনার্ভা থিয়েটারে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বরে প্রথম অভিনীত হয়। আলিবাবার অভিনয় প্রসঙ্গে বাংলার রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান (শঙ্কর ভট্টাচার্য) গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে -- সম্ভবত এই নাটকটি অতুলকৃষ্ণ মিত্রের রচনা। আগেই প্রসঙ্গটি উল্লেখিত ; নবাব সৈয়দ আমীর হোসেন, প্রিন্স বক্তিয়ার শাহ্ এবং নবাব আব্দুল শোভান চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং উপস্থিতিতে মিনার্ভায় এই 'আলিবাবা' নাটকটি অভিনীত হয়েছিল।

এই তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, মিনার্ভা এবং ক্লাসিকে একসঙ্গে আলিবাবা অভিনীত হয়েছিল --ক্লাসিকের আলিবাবার রচয়িতা ছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ আর মিনার্ভার আলিবাবার রচয়িতার নাম প্রমথনাথ দাস — কিন্তু, রঙ্গমঞ্চ বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন যে, নাটকটির রচয়িতা অতুলকৃষ্ণ মিত্র। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই বিতর্কের সম্পর্কে জানিয়েছেন — 'ইহার পূর্বে (ক্ষীরোদপ্রসাদ 'আলিবাবা' নাটকটি রচনার পর স্টার থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য তৎকালীন ম্যানেজার অমৃতলাল বসুর কাছে যান। কিন্তু, অমৃতলাল নাটকটি অভিনয়ের অযোগ্য বিবেচনা করেন) শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার 'আলিবাবা'-র পাণ্ডুলিপি আমায় দেখাইয়াছিলেন, রঙ্গালয়ের অভিনয়োপযোগী পরিবর্তন করিয়া শ্রীমান অমরেন্দ্রনাথ ও পরিবর্তিত পাণ্ডুলিপি আমার নিকট আনেন; আমার সামান্য সাহায্যও লন।' এই সামান্য সাহায্য হল আলিবাবার প্রথম গানটি —'বাজে কাজে মিন্‌সেকে আর যেতে দেব না।' অতুলকৃষ্ণ মিত্র দাবি করেছেন — 'তিনি আলিবাবা কাটিয়া-ছাঁটিয়া ও তাহাতে প্রায় ৩০খানি গীত রচনা করিয়া অমরবাবুকে অভিনয়ের জন্য অনুরোধ করেন। গিরিশবাবুর নিকটে ঐ আলিবাবা পড়াইয়া শুনানো হয়, তাতে তিনি আনন্দ প্রকাশ

করেন ও ২খানি গান বাঁধিয়া দেন ও অমরবাবু ২খানা গান দিয়া অভিনয় করিতে আরম্ভ করেন।' এই তথ্য যদি ঠিক হয় তাহলে 'আলিবাবা' গীতিনাট্যের ৩৬টি গানের মধ্যে ৩৪টি অন্যের লেখা—একথা প্রমাণিত হয়। কিন্তু, ক্ষীরোদপ্রসাদ নাট্যগীত, রচনায় যথেষ্ট পারঙ্গম ছিলেন, তাই, 'আলিবাবা'-র সিংহভাগ গান অতুলকৃষ্ণ মিত্রের লেখা এ কথা আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন। আর একটি তথ্য, ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা'-র মঞ্চসাফল্যে, উৎসাহিত হয়ে প্রমথনাথ দাস যে, 'আলিবাবা' নামক নাটকটি রচনা করেন তার উৎসর্গপত্রে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন — 'আপনার সাহায্য ও যত্নে আলিবাবা গীতিনাট্যখানি প্রকাশ করিয়াছি। আপনি আমাকে ভালোবাসিয়া থাকেন এবং আমার আবদার সহিয়া থাকেন বলিয়া, এই নীতিনাট্য খানির সমস্ত দোষ মার্জনা করিবেন।' অবাক হওয়ার মতো ঘটনা হল ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা'-র সঙ্গে এই 'আলিবাবা'-র কাহিনীগত মিল আছে শুধু নয় — দুটি নাটকের গানের ভাষাতেও যথেষ্ট মিল আছে। অতুলকৃষ্ণ সম্ভবত প্রমথনাথ দাসের 'আলিবাবা'-র গানগুলি রচনা করেছিলেন বলেই আমাদের ধারণা। জনপ্রিয়তায় ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা' তুলনাবিহীন। আজও চলচ্চিত্র, নাটক, গীতিনাট্য — সবক্ষেত্রেই ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা'রই প্রাধান্য। জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে নকলনবিশ প্রচেষ্টা যে শেষ পর্যন্ত সার্থক হয় না; বরং সমকালে এবং কালস্রোতে হারিয়ে যায়, গুড়িয়ে যায়, অপর 'আলিবাবা' রচনা সম্পর্কে এই কথাই বোধহয় যথেষ্ট।

আলিবাবা নাটকের অভিনয় থেকে অমরেন্দ্রনাথ লক্ষাধিক টাকা লাভ করেছিলেন সেই সঙ্গে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদেরও খ্যাতি-স্বীকৃতির দরজা উন্মোচিত হয়েছিল বিশেষভাবে, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৩০১.৪.১৩.৩ : 'আলিবাবা' নাটকের নামকরণ

'আলিবাবা' নাটকের নামকরণ প্রসঙ্গে নানা অভিযোগ আনা যায়। সমালোচকেরা বলে থাকেন, আলিবাবা অপেক্ষা মর্জিনা এবং আবদালা চরিত্র দুটি অনেক বেশি সক্রিয়, গোটা নাটকে তাদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ; বিশেষত মর্জিনার মত অবিস্মরণীয় চরিত্র থাকা সত্ত্বেও আলিবাবার নামে নাটকের নামকরণ হওয়া যথার্থ নয়। যদিও মূল আরব্য কাহিনীর নাম -- 'আলিবাবা ও চল্লিশ চোর'। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের কাহিনীর ভিত্তিতে আলিবাবার ভূমিকা আমাদের আকৃষ্ট করে না। এই কাহিনী থেকে বিভিন্ন সময়ে যে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে সেক্ষেত্রে নামকরণে পরিবর্তন বিশেষভাবেই লক্ষনীয়। 'মর্জিনা-আবদালা' বা 'আবদাল্লা' নামই প্রাধান্য পেয়েছে বিশেষভাবে। আলিবাবা নামকরণের ক্ষেত্রে চল্লিশ দস্যু চোর-এর কথা যুক্ত হয়েছে, বিষয়টিকে জোরদার করতে, গুরুত্ব দিতে।

দ্বিস্তরে বিন্যস্ত কাহিনীতে চল্লিশ দস্যু বা ডাকাতদের সঙ্গে সংযুক্তি আলিবাবার মাধ্যমে। গরিব কাঠুরে, ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আলিবাবা জঙ্গলে গিয়ে অকস্মাৎ সেই ধনরত্নে পরিপূর্ণ গুহার হদিশ পায়। গুহায় প্রবেশের পর গরীব আলিবাবার লোভ বাঁধ ভাঙে। বেশ কয়েকটি বস্তায় ধনরত্ন সহ গুহা থেকে বেরিয়ে গাধার পিঠে চাপিয়ে বাড়িতে পৌঁছে ফতেমার মুখোমুখি হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। 'ওমরাহ' ভাই কাশেম, ভ্রাতৃবধূ সাকিনার চর্তুগুণ লোভের অনুসারী হয়ে কাহিনীর পরিণতিতে দেখা গেল — (ক) কাশেমের মৃত্যু (হত্যা), (খ) সাকিনার আলিবাবাকে বিবাহ, (গ) ত্রি-খণ্ডিত কাসেমের মৃতদেহ চর্মকার মুস্তাফার সাহায্যে মর্জিনার জোড়া লাগানো, (ঘ) দস্যু দলপতির মোস্তাফার সাহায্যে আলিবাবার সন্ধান, চোখ বাঁধা অবস্থায় আলিবাবার বাড়ি পৌঁছানো (ঙ) চল্লিশজন দস্যুসহ দস্যুদলপতির আলিবাবাকে মেরে প্রতিশোধ নিতে উপস্থিত হওয়া

(চ) মর্জিনা ও আবদালার যৌথ প্রচেষ্টায়-বুদ্ধিমত্তায় দস্যুদের পরাজয় — মৃত্যুমুখে পতিত এবং দস্যুসর্দার কর্তৃক মর্জিনাকে সমস্ত ধনসম্পত্তি দান। নাটক শেষ।

নাটকের প্রথম স্তর বা ভাগে আলিবাবা নিষ্প্রভ, তুলনায় দ্বিতীয় স্তরে (বা ভাগে) খানিকটা সক্রিয়তার দেখা পেলেও বুদ্ধিদীপ্তি, বিপর্যস্ত ভাগ্যকে অতিক্রমণের দুরন্ত সাহস, পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই, সমগ্র ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ এবং পরিণতিতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ — কোনোটাই তার মধ্যে লক্ষ করা যায় না, কোনোভাবেই না। অতএব — নামকরণে তার প্রাধান্য মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না। বরং 'মর্জিনা আবদালা' যুৎসই। প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত প্রতি ঘটনার সঙ্গে তাদের সংযুক্তি, পরিণতিতে চিত্তচমৎকারী ভূমিকা, নাচ-গান — যা এই নাটকের অন্যতম উপজীবী তা তো তারাই করেছে। তাদের নামে নামকরণে তাই কোনো দ্বিধা থাকাও উচিত নয় কারো।

৩০১.৪.১৩.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। আলিবাবা' নাটকের নামকরণ যথার্থ হয়েছে কি? আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

২। 'আলিবাবা' নাটকে রঙ্গরসের বিষয়টি পরিস্ফুটিত করো।

৩। উপযুক্ত নাট্য ঘটনার দৃষ্টান্ত দিয়ে 'আলিবাবা' নাটকটির কৌতুকরসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করো।

————

একক - ১৪

'আলিবাবা' নাটক রচনার প্রেরণা, মৌলিকতা এবং নৈতিক শিক্ষা

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.৪.১৪.১ : 'আলিবাবা' নাটক রচনায় প্রেরণা, মৌলিকতা এবং নৈতিক শিক্ষা।

৩০১.৪.১৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০১.৪.১৪.১ : 'আলিবাবা' নাটক রচনায় প্রেরণা, মৌলিকতা এবং নৈতিক শিক্ষা

আরব্য উপন্যাসের কাহিনী থেকে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন সময়ে নানা প্রেমকাহিনী, রূপকথার কাহিনী রচিত হয়েছে। স্বভাবতই সেই কাহিনীগুলি ছোট-বড় সকলের কাছেই সমাদৃত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কাহিনীগুলির মধ্যে আছে -- **লায়লা মজনু, সয়ফুল - বদিউজ্জমাল, আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ, আলিবাবা ও চল্লিশ চোর** ইত্যাদি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ইসলামধর্মী লেখকেরা এইসব বিষয় অবলম্বনে কাব্যরচনা করেছেন আর আধুনিককালে রচিত হয়েছে নাটক। গিরিশচন্দ্র প্রথম নাট্যকার যিনি আরব্য-পারস্য কাহিনী থেকে নাটকের বিষয় খুঁজে নিয়েছেন। তাঁর রচিত 'আবুহোসেন', 'আলাদিন বা আশ্চর্য প্রদীপ', 'পারস্য প্রসূন' বা 'পারিসানা', 'মায়াতরু', 'মোহিনী প্রতিমা', 'ফনীরমণি' ইত্যাদি রঙ্গগীতিনাট্যরূপে শুধু বিখ্যাতই নয় — সেই সঙ্গে মঞ্চ সফলও।

ক্ষীরোদপ্রসাদ গিরিশচন্দ্রের 'আলাদিন' এবং 'আবুহোসেন' রঙ্গগীতিনাট্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রথমে 'আলিবাবা' ও পরে 'আলাদিন' (১৯০৭) রচনা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আরব্য উপন্যাসের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন স্যার রিচার্ড ফ্রান্সিস বার্টন (১৮২১-৯০) ;— কিন্তু তার দশখণ্ডে রচিত এই বড়মাপের অনুবাদকর্মটি ভিক্টোরীয় যুগে খুবই আপত্তিকর ছিল। বার্টন-এর আগে আর যারা সংশ্লিষ্ট কাহিনী অনুবাদ করেছিলেন তাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রখ্যাত এডওয়ার্ড উইলিয়ম লেন (১৮০১-১৮৭৬)। তাঁর অনুবাদের সময়সীমা ১৮৩৮ থেকে ১৮৪০। তাঁর 'আলিবাবা' নাটকটি পড়ে বোঝা যায় যে, স্বতন্ত্র উৎস থেকে তিনি কাহিনী নির্মাণ করেছেন। যেমন কাশেমের পুত্র তথা আলিবাবার ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা বার্টন বলেছেন যার সঙ্গে মর্জিনার বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু, এডওয়ার্ড উইলিয়ামের অনুবাদে কাশেমের কোনো পুত্রের কথা উল্লেখিত হয়নি বরং আলিবাবার উল্লেখ আছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর নাটকে হুসেনকে আলিবাবার পুত্ররূপে চিহ্নিত করেছেন।

আরব্য উপন্যাসের কাহিনী প্রধানত রূপকথা (Fairytales) । তবে নীতিকথা (Fables)'র বিষয়টি কিন্তু উপেক্ষিত হয়নি। কল্পিত কাহিনী সৃষ্টিতে এর কোনো জুড়ি নেই। তাই শতাব্দীর পর শতাব্দী, বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষ এই কাহিনী পাঠ করে বা চলচ্চিত্রে অথবা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখে আকর্ষণের গভীর বাতাবরণে পৌঁছয়।

এইসব রূপকথার কাহিনীতে সবই সম্ভব। তাই আজ যে রাজা, কাল সে নিঃস্ব ফকির হয়ে যেতে পারে। একরাত্রের জন্য সাধারণ আবু হোসেন বাদশা বনে অভিপ্সিত সবকিছুর বাস্তবায়ন ঘটাতে এগিয়ে

যায়। 'সবকিছু'র মধ্যে আছে — অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনা নিরসন। ঘুষখোর দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষদের চরম শাস্তি, সুস্থ জীবনায়নে, আইনের শাসনে জনসাধারণের কল্যাণই সেখানে মুখ্যস্থান জুড়ে থাকে। আলাদিন আশ্চর্য প্রদীপ হাতে পেলে যা খুশি তাই করতে পারে। একইভাবে গরিব কাঠুরে আলিবাবা চল্লিশজন ডাকাত / চোর - এর সঞ্চিত ধনরত্নের সন্ধান পায়, ইচ্ছেমতো তার খানিকটা বাড়িতে এনে বিত্তশালী হবার প্রচেষ্টা চালায়। ওই চল্লিশজনের প্রতিহিংসার হাত থেকে মর্জিনা ও আবদালার অসম্ভব প্রয়াসে সে এবং পরিবার-পরিজন বাঁচে । দলনেতা সহ চল্লিশজন দস্যুর অপমৃত্যু ঘটে।

'আলিবাবা' নাটকের এই হল মূল কাহিনী। আলিবাবার মোহর-ধনরাশি প্রাপ্তির পর দুঃখ-দুর্দশা দূর হয়। ক্রীতদাসীবৃত্ত থেকে মর্জিনার মুক্তি ঘটে। কাশেমের কাছ থেকে সে মর্জিনাকে কিনে নেয়। পরে প্রেমের পরিণতি মর্জিনার বিবাহ হয় আলিবাবার পুত্র হুসেনের সঙ্গে। কাশেম লোভের বলয়ে প্রত্যাবর্তনের পথ খুঁজে না পাওয়ায় অবশেষে মৃত্যু হয়। তার দেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে টাঙিয়ে রাখে দস্যুরা। দস্যুদের হাতে কাশেমের চার খণ্ডের মৃতদেহ চর্মকারি মোস্তাফা জোড়া দেয়। মর্জিনার ভূমিকা প্রধান হয়ে ওঠে সবক্ষেত্রেই। সাকিনা আলিবাবাকে বিবাহ করে। সকলে তা মানেও। সর্দার সহ আলিবাবার বাড়িতে দস্যুরা আলিবাবাকে মারতে এলে মর্জিনার বুদ্ধি — সক্রিয় ভূমিকা -- সকলের প্রশংসা পায়। আলিবাবা বেঁচে যায়, সর্দার সহ দস্যুদের মৃত্যু ঘটে। লোভ-মোহ-দম্ভ-অহংকার -- রাতারাতি ধনী - বিত্তশালী হলে, জীবনাচারণে প্রভেদ ঘটে -- প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির এইসব দিকগুলি নীতিশিক্ষার (Fbles) বিষয় হয়ে ওঠে। দস্যু সর্দারের অজস্র ধনরত্ন 'বেটি' মর্জিনাকে দান করে যায়। মর্জিনা তা গ্রহণ করে মানবকল্যাণ এবং প্রকৃত ধর্মচর্চার কাজে নিয়োজনে সংকল্পবদ্ধ হয়। নাটকও শেষ হয়।

'আলিবাবা' নাটকে মোট তিনটি অংক এবং অংকগুলি দৃশ্যে বিভাজিত তা যথাক্রমে ছয়, ছয় এবং সাত। অপেরাধর্মী এই গীতিনাট্যে গানের সংখ্যা — ৩৬টি। গিরিশচন্দ্রের ভাষ্য অনুযায়ী এই জাতীয় নাটক হল — রঙ্গনাট্য। গিরিশচন্দ্র রঙ্গনাট্যে রঙ্গরসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ক্ষিরোদপ্রসাদ রঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করেছেন মানবিক রস। সেই সঙ্গে জীবন জিজ্ঞাসার বিষয়টি আলোকিত হয়েছে। এরই অনুষঙ্গে নীতিশিক্ষার দিকটিও (লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু -- এইসত্য) প্রাধান্য পেয়েছে। সাকিনা কাশেমের ভূমিকা, আচরণকে দর্শক যেমন মেনে নিতে পারে না, আমরাও পারি না। নাট্যকারও পারেননি। তাই কাশেমের মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না। প্রশ্ন ওঠে আলিবাবার মর্জিনাকে বিবাহ প্রসঙ্গে। এই ভাবনা আরব্য উপন্যাসে নেই, গিরিশচন্দ্রের নাটকে নেই। এখানে আছে দার্শনিক মনের হদিশ মেলে অর্থবিত্তকে কেন্দ্র করে। যা ভোগের, তাই আবার ত্যাগের সামগ্রী হয়ে ওঠে। তিনটি দৃষ্টান্ত -- (ক) আলিবাবা ধনসম্পত্তি পাওয়ার পর মর্জিনাকে বলে --- 'আমরা অনেক টাকা পেয়েছি, তার নেশা আমরা কেউ বরদাস্ত করতে পারছি না—টাকাগুলো তুই নিবি? (খ) ডাকাত সর্দার বলেছে -- 'টাকা কি আর ভোগ হবে বলে রোজগার করছি? খোদার খাজাঞ্চিখানা, আমরা তাঁর জমিনদার। কতকাল ধরে আমাদের এই গুপ্তভাণ্ডারে ধন সঞ্চয় হচ্ছে, আমাদের মধ্যে কে জানে? একজনের পর একজন, তারপর আর একজন, এইরকম কত হাত ফিরে, শেষে এই ধনাগারে ধনসঞ্চয়ের ভার আমাদের হাতে পড়েছে। তারপর আমাদের হাত থেকে হাত বদলে, এই ভার দুনিয়ার, শেষপর্যন্ত চলে যাবে।' (গ) মর্জিনা দস্যু সর্দারের সব ধনরত্নে মালিক হবার আহ্বান সত্ত্বেও জানায় — '.... আমার ধনে কাজ কি? আমি তোমার নামে সেই ধন কাছে গচ্ছিত রাখবো।' ... এটি নীতিশিক্ষার বিষয়। তাহলে সংক্ষেপে দাঁড়াচ্ছে মূল্যবোধ-নৈতিক শিক্ষা বিষয়গুলি — (অ) লোভ-লালসা নয় (আ) কাউকে কখনও ঠকানো - প্রবঞ্চনা করা অনুচিত। (ই) অকস্ম্যৎ অর্থ প্রাপ্তিতে মাথা ঘুরে গেলে চলবে না। মতি-স্থিতি ও সুপরিচলানার প্রয়োজন (ঈ) সৌভ্রাতৃত্ব সবসময় কাম্য। (ঙ) ঈর্ষা কখোনই কাম্য নয়।

আরব্য উপন্যাসের আলিবাবা ও চল্লিশ ডাকাতের কাহিনী 'আলিবাবা' নাটকে একদিকে যেমন সংক্ষিপ্ত হয়েছে, তেমনি আবদালা-মর্জিনা মুস্তাফা আর হুসেন কাহিনীকে টেনে বাড়ানো হয়েছে। নৃপেন্দ্র

চন্দ্র বসু ও কুসুমকুমারীর নাচ-গানের জন্য আবদালা ও মর্জিনা বিশেষভাবে পরিকল্পিত হয়েছে। আর অমরেন্দ্রনাথকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে হুসেন চরিত্রটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। নাটকে কিছুটা বোকা, কিছুটা একরোখা, কখনো লাজুক কখনো প্রগল্‌ভ রোমান্টিক নায়কের ভূমিকায় হুসেনের উপস্থিতি নাটকের শেষে পট পরিবর্তন এবং সিংহাসনে হুসেন ও মর্জিনা (সিংহাসনের তলে আবদালা) দু-পাশে ফতিমা ও সাকিনা। এই সঙ্গে 'চাঁদ চকোরে' অধরে অধরে/গিয়ে সুধা প্রাণ ভরে' - গানটির সংযোজন রোমান্টিক কমেডিতে নাট্য পরিণতি ঘটিয়েছে। নাট্যকার এছাড়াও অতিরিক্ত যে চরিত্রগুলি সংযোজিত করেছেন তা হল কাশেমের ইয়ারগণ, ফতিমার প্রতিবেশিরা এবং শেষ দৃশ্যে হাকিম। এছাড়া আমরা দেখতে পাই 'চিচিং ফাঁক' শব্দটির উদ্ভাবন। ক্ষীরোদপ্রসাদ বনে-জঙ্গলের মধ্যে গুপ্তদুয়ার খোলার ক্ষেত্রে 'চিচিং - ফাঁক' শব্দটির উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন; কিন্তু নাট্য অভিধানে গিরিশচন্দ্রকে এর উদ্ভাবক বলা হয়েছে। আমরা জানি, আরব্য উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদে সকলেই পাহাড়ের গুপ্ত দুয়ার খোলা ও বন্ধ করার মন্ত্র রূপে। 'সিসেম' (Sesame) এবং বার্টনের অনুবাদে সিম্‌সিম্‌ (Simsim) অর্থাৎ তিলের গাছ বা তিলের কথা বলেছেন। 'Open sesame', 'Shut Sesame' ইংরেজি অভিধানে এমন এই অর্থেই স্থান পেয়েছে। কিন্তু কাসিম শব্দটি ভুলে 'Open Barley' থেকে শুরু করে নানা ধরণের শস্যকনার নাম করেছে। আমরা নাট্যসংলাপে ফিরে যেতে পারি — সেখানে উদ্‌ভ্রান্ত কাশেমের মুখে শোনা যায় — 'মানুষ খেতে না পেলে কি করে? খাই খাই। খাই খাই ফাঁক খোলে না ত। কি কল্লুম -- সর্বনাশ কল্লুম? মানুষ খেতে না পেলে কি করে? -- ওই তো করে -- আবার কি করে? দে দে -- না না তাও ত নয়; হা হা -- তাও যে নয় গো! ওরে বাবা কি কল্লুম। খেতে না পেলে কি করে? মোট বয় চাকর হয় -- চুরি করে, বাটপাড়ি করে -- আমার মাথা করে, মুণ্ডু করে, -- ওরে বাবারে, কি কল্লুম রে!' অন্যদিকে 'না না, সেটা যে একটা ফলের নাম -- ফাঁক ফাঁক, ঢেঁড়স ফাঁক, রাই ফাঁক, সর্ষ ফাঁক, তিল ফাঁক, --মস্‌নে ফাঁক -- আল্লার দোহাই ফাঁক। ফাঁক, ফাঁক, ফাঁক (উন্নতভাবে পরিভ্রমণ) গম ফাঁক, অড়র ফাঁক, মটর ফাঁক, ভুট্টা ফাঁক! এখানে 'চিচিঙ্‌ ফাঁক', এবং 'Open, Sesame' দুটি শব্দ যেন কাসেমের মনের মধ্যে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। আসলে কাশেমের মনে নয়, নাট্যকারের মনে।

৩০১.৪.১৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'আলিবাবা' নাটকটিতে নৈতিকতার যে দিকগুলি উন্মোচিত হয়েছে তা দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

২। আরব্য উপন্যাসের কাহিনী নিয়ে রচিত 'আলিবাবা' নাটকে মূল্যবোধ ও নীতিশিক্ষার কোন্‌ কোন্‌ দিকগুলি প্রাধান্য পেয়েছে–দৃষ্টান্তসহ বুঝিয়ে দাও।

————

একক - ১৫

মর্জিনা চরিত্র

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.৪.১৫.১ : মর্জিনা চরিত্র

৩০১.৪.১৫.২ : বিপরীতমুখী চার চরিত্র

৩০১.৪.১৫.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০১.৪.১৫.১ : মর্জিনা চরিত্র

মর্জিনা বাংলা নাটকের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে অবিস্মরণীয় চরিত্র। নারী-পুরুষের ভেদ রেখা না টেনেই একথা বলা যায়। মর্জিনার মধ্যে যে চারিত্রিক গুণ-অবস্থান-বৈশিষ্ট্যগুলি সূর্যের প্রাখর্যে দীপ্যমান সেগুলি — (ক) সৌন্দর্য। অন্তরে বাহিরে সুন্দরী সে, (খ) নৃত্যগীত পটিয়সী, (গ) বাক্‌পটুতা, (ঘ) প্রত্যুৎপন্নমতি বা উপস্থিত বুদ্ধি, (ঙ) ভাগ্যের বিড়ম্বনায় কাশেম-সাকিনার দাসী হয়েও তার বুক জুড়ে ছিল অনন্তপ্রেম, সেই প্রেমেই ডুব দিয়ে হুসেন জীবনের অর্থ (meaning) খুঁজে পেয়েছে, (চ) সাহসী এবং চাতুর্যের আশ্রয়ে তৎপর (ছ) সকলের নির্ভরশীলতা তার উপর, (জ) সর্বোপরি মানবিকতা পরিপূর্ণ তার হৃদয়, তাই ন্যায়-নীতির পক্ষপাতী, অন্যায় - অত্যাচারে প্রতিবাদী, (ঝ) দার্শনিক প্রত্যয়, (ঞ) সার্বিক জীবনের, (Total Life) বার্তাবাহী, অপরিসীম জীবনাবেগ (Life Force)।

এই দশটি বৈশিষ্ট্যের, দশটি দৃষ্টান্ত আমরা অনায়াসেই তুলে ধরব। মর্জিনা স্বপ্ন দেখতেও জানে, দেখেও। তাই প্রথম অঙ্কের, প্রথম দৃশ্যের শুরুতেই সে জানিয়ে দেয় আবদালাকে — 'যে দিন বেগম হব, সে দিন তোকে হাজার কোড়া লাগাব।' আবদালা প্রতি উত্তরে ব্যঙ্গ করলে সে প্রত্যয়ের সঙ্গে জানায় — 'আমি কি বেগম হতে পারি না?' অথবা 'আমি বেগম হয়েছি জেনে রাখ।'

এ শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়, নিজের ক্রীতদাসী জীবন থেকে মুক্তি ও উত্তরণের অভীপ্সা। মর্জিনার বর্ণনা, তার চলাফেরার প্রতি নজর দিলে আমরা তার সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করি। সে নৃত্যগীতে পারঙ্গম। নাটকের সূচনা, তার ও আবদালার নৃত্যগীতের মাধ্যমে। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে, হুসেনের জিজ্ঞাসার উত্তরে সে জানায়, — 'ভালবাসি কিনা জিজ্ঞাসা কচ্ছ? ..... একটু একটু বাসি বৈ কি।' দস্যু সর্দারকে চিনতে জানতে না পেরে তৃতীয় অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে আলিবাবা 'দরবেশ' বলে উল্লেখ করলে, মর্জিনাই বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে জানায় — 'সে কি দরবেশ? বিশ্বাস হয় না। নইলে নেমক খায় না কেন? কি করি — একটা ভাল মানুষকে কি শেষকালে হত্যা করে বসবো? ভালমানুষ কখনই নয়। ডাকাত, সেই ডাকাত; ভোল বদলেছে — নইলে নেমক খায় না

কেন, প্রতিজ্ঞা করেছে যে আলির জান না নিয়ে নেমক খাব না। তাই এসেছে, তাই হুসেনের সঙ্গে যেচে আলাপ করেছে — উপযাচক হয়ে দোস্তি পাতিয়েছে। উপযাচক হয়ে বিনা স্বার্থে কেউ কি কারও সঙ্গে ভাব করে? কই তাত দেখিনি। ডাকাত — আলবাৎ ডাকাত। কি করি? ডাকাত তাতে আর সন্দেহ নেই — তবে কেমন ক'রে আলির প্রাণ রক্ষা করি? ঈশ্বর, আর একবার সহায় হও — যদি নিরপরাধ হয়, আমার হাত নিস্পন্দ কর; যদি দস্যু হয় — হাতে বজ্রের বল দাও।'

প্রত্যুপন্নমতিত্বের পরিচয় নানাভাবে পাওয়া গেছে। মুস্তাফাকে চোখ বেঁধে বাড়িতে নিয়ে এসে কাসেমের খণ্ডিত দেহ জোড়া লাগিয়েছে। চোখ বেঁধে আনার কারণ যাতে সে অন্য কাউকে বা দস্যুদের বাড়ির হদিশ না দিতে পারে। আবার আবদালার সঙ্গে যুক্তি করে পিপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে থাকা দস্যুদের গরমতেল ঢেলে হত্যা করেছে এবং আলিবাবা ও হুসেনের প্রাণ বাঁচিয়েছে। হুসেনের সঙ্গে তার প্রেম, ভবিষ্যতে তাকে গৃহবধূ করার তীব্র বাসনায় আলিবাবা কাসেমের কাছ থেকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে দাসীত্ব থেকে মুক্ত করে। মর্জিনার মধ্যে স্বভাবতই কৃতজ্ঞতার প্রতিসরণ। দস্যু সর্দার তাকে সব ধনরত্ন দান করে দিলে, নির্লোভী মর্জিনা দার্শনিক প্রজ্ঞা নিয়ে জানায় — 'আর আমার ধনে কাজ কি? আমি তোমার নামে সেই ধন খোদার কাছে গচ্ছিত রাখব। মরুভূমিতে পথিকের জন্য কূপ খনন করবো। ক্ষুধার্তের জন্য দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে অন্নসত্রের ব্যবস্থা করব? আর জলহীন দেশে দীর্ঘ সরোবর খনন করে দেব। আর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, সমস্ত ধর্মের জন্য রেখে দেব।' এভাবেই সবকিছুর মধ্য দিয়ে মর্জিনা, নাটকে সকলের এবং আমাদের কাছেও চলমান জীবনে অত্যন্ত আপনজন হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বড় কথা এমন প্রাণের বেগ (life force) প্রাণতপস্যা এবং বহুমুখীতা বাংলা নাটকে আর কোনো নারীর মধ্যে দেখা যায় নি।

৩০১.৪.১৫.২ : বিপরীতমুখী চার চরিত্র

ফতিমা ও সাকিনা এবং আলিবাবা ও কাশেম — পরস্পর বিরোধী চরিত্র। দুই সহোদর এবং তাদের দুই পত্নি বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। ফতিমা 'সহজ সরল।' আলিবাবা কষ্ট করে যে কাঠ কেটে আনে ফতিমা তা বিক্রি করে। এরমধ্যে দিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। সাকিনা কাঠ কেনার সময় নানাভাবে ফতিমাকে ঠকায়। সে বোঝে না। মর্জিনা ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করেও পারে না। আলিবাবা ডাকাতদের সঞ্চিত ধনরত্ন গুহা থেকে নিয়ে আনার পর তার আনন্দ-উল্লাস-চিৎকার এবং হরিভাবে প্রায় সবটাই জানাজানি হয়ে যায়। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে, যখন তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে তখনও তার সারল্য জটিলতার দিকে সরে যায়নি। অতীত জীবনকে আলিবাবা সহজে ভুলে গেলেও ফতিমা পারে না। আবার কাশেমের মৃত্যুর পর সাকিনার সঙ্গে আলিবাবার বিবাহ হলে সে ক্ষুব্ধ হয় আবার অচিরেই সেই 'নিকাহ' মেনেও নেয়। একসময়ে যে শোষণ করেছে -- বিদ্রূপ করেছে -- তাকে 'সতীন' রূপে পাশে নিয়ে চলতে ফতিমার কোনো অসুবিধাই হয় না।

তেমন আবদালার জন্য আমাদের কষ্ট হয়। তার জীবনের কোনো পরিবর্তন সূচিত হয় না। মোস্তাফা, দস্যু সর্দার নিজের নিজের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। তবে হুসেন আরো সক্রিয় হলে, নাট্যরস আরো ঘনীভূত হত। রসরঙ্গের দিক থেকে সংলাপ, নাচ - গান এবং কিছু কিছু আচরণ স্মরণীয়। মর্জিনা - আবদালা, আলিবাবা - ফতিমা, কাসিম — প্রমুখের ক্ষেত্রে এই রসরঙ্গ মূর্ত হয়েছে নানা সময়ে।

৩০১.৪.১৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'মর্জিনা' বাংলা নাটকের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় চরিত্র। — আলোচনা করো।

২। ফতেমা ও সাকিনা এবং আলিবাবা ও কাশেম চরিত্রদুটির বিপরীতমুখীতার বিষয়টি আলোচনা করো।

৩। মর্জিনা 'আলিবাবা' নাটকের সবচেয়ে সক্রিয় এবং উজ্জ্বল চরিত্র। এই অভিমতটির যথার্থতা বিচার করো।

————

একক - ১৬

সংলাপ ও সংগীত

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.৪.১৬.১ : 'আলিবাবা' নাটকের জনপ্রিয়তার কারণ

৩০১.৪.১৬.২ : সংলাপ ও সংগীত

৩০১.৪.১৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০১.৪.১৬.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০১.৪.১৬.১ : 'আলিবাবা' নাটকের জনপ্রিয়তার কারণ

বিশিষ্ট ফরাসী নাট্যকার তথা উপন্যাসিক ভিক্টর হুগো নাটকের অভিনয় দেখতে আসা দর্শকদের চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন —

(ক) বোদ্ধা দর্শক -- যারা সম্পূর্ণ নাটকটিই চিন্তাভাবনা নিয়ে প্রত্যক্ষ করে।

(খ) রসিক দর্শক -- যারা নাটক দেখতে এসে নাটকের হৈ-হুল্লোড় রঙ্গ-ব্যঙ্গ দেখতেই বেশি পছন্দ করে।

(গ) নৃত্যগীতে আকৃষ্ট দর্শক -- এরা নাচ - গান বিশেষত মহিলাদের অর্থাৎ অভিনেত্রীদের নাচ-গানের প্রতিই আকর্ষণ বোধ করে।

(ঘ) সর্বশেষ দর্শকেরা হল চটুল, নারীর যৌন আবেদনই তাদের কাছে প্রধান। অভিনেত্রী দেখার জন্যই তারা ভিড় জমায়, ভিক্টর হুগো কর্তৃক শ্রেণী বিভাজিত এই দর্শকদের দেশ-কাল নির্বিশেষে সর্বত্রই প্রত্যক্ষ করা যায়।

ক্ষীরোদপ্রসাদ রচিত এবং অমরেন্দ্রনাথ দত্ত অভিনীত ও নির্দেশিত 'আলিবাবা'-র জনপ্রিয়তার কারণগুলি খুঁজতে গেলে দর্শকদের এই শ্রেণীবিভাজনের কথা আমাদের মাথায় রাখতেই হয়। 'আলিবাবা' -- নাটকটি দেখতে উপরে বর্ণিত এই চারশ্রেণীর দর্শকই আসত এবং আমোদ প্রমোদের সবটুকু নিংড়ে নিয়ে বাড়ি ফিরত। এছাড়াও ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত 'আলিবাবা',-র অভিনয়ে মঞ্চসজ্জা, সুর-সংগীত সংযোজন - নৃত্য পরিকল্পনা-পরিবেশনা-পরিচালনা সর্বোপরি অমরেন্দ্রনাথ, কুসুমকুমারী, নৃপেন্দ্রনাথ সহ সকলের দাপুটে অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, সেই সময়ে রঙ্গরস সমৃদ্ধ গীতিনাট্য আর কোনো মঞ্চে অভিনীত হচ্ছিল না। তাই, দর্শকেরা ক্লাসিকে এসে নাটক দেখার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত অন্যান্য বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ করায় এই নাটকের জনপ্রিয়তা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক কিংবা চেনাজানা সামাজিক নাটক দেখতে দেখতে দর্শকেরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আর একটি বড় কথা, আরব্য কাহিনী থেকে গৃহীত 'আলিবাবা'-র নাট্যবস্তু গৃহীত হয়েছিল, মূল কাহিনীটি রূপকথা। চলমান বাস্তবের প্রাত্যহিকতার গ্লানি ঘোচাতে দর্শকেরা কাহিনী আশ্রয়ী এই অপেরাধর্মী রূপকথার নাটকে বেশি আনন্দ পেয়েছিল। মিনার্ভায় অভিনীত 'আলিবাবা', ক্লাসিকে অভিনীত 'আলিবাবা'-র কাছে জনপ্রিয়তায় হেরে গিয়েছিল এই কারণে। প্রচুর অর্থব্যয়ে অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিককে সজ্জিত করেছিলেন। দর্শকদের আনুকূল্যও উপচে পড়েছিল। অর্থাগমের বিষয় -- সে তো ইতিহাস, তার কথা আগেই উল্লেখিত।

৩০১.৪.১৬.২ : সংলাপ ও সংগীত

পাশ্চাত্যের সমালোচকেরা সংলাপকে (Dialogue) নাটকের প্রাণ বলে অভিহিত করেছেন। ভারতীয় নাট্য সমালোচকেরা সংলাপকে এতটা গুরুত্ব না দিলেও সংলাপের অপরিহার্যতাকে স্বীকার করেছেন। এটা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না যে, নাটকের কাহিনী বয়ন এবং চরিত্রচিত্রণ সংলাপ ছাড়া হতে পারে। আমাদের আলোচ্য 'আলিবাবা' নাটকের সংলাপ প্রসঙ্গে জরুরী কয়েকটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন —

(ক) এটি একটি গীতিনাট্য।

(খ) শুধু গীতিনাট্য বললেও সম্পূর্ণ বলা হয় না সেই সঙ্গে নৃত্যও যুক্ত হয়েছে।

(গ) এককথায় বরং বলা চলে অপেরাধর্মী নাটক।

(ঘ) প্রথাগত নাট্যধারার মাঝে দর্শকদের আনুকূল্য লাভে ক্লাসিক থিয়েটারের মালিক এমন অপেরাধর্মী নাটকই বেছে নিয়েছিলেন কেননা তাঁর লক্ষ্য ছিল - অর্থাগম আর তা সম্ভব হয়েছিল দর্শকদের ব্যাপক উপস্থিতির মধ্যদিয়ে।

(জ) দর্শকেরা আপ্লুত হয়েছে, কখনও আবিষ্ট থেকেছে, আবার কখনও বিস্ময়ের ঘোরে থেকেছে, এই নাটকের নাচ, গান, অভিনয় আবদ্ধ দৃশ্য -- মঞ্চ, পোষাক-আসাক সবকিছু দেখা ও শোনার মধ্য দিয়ে।

মৌলিক বাংলা নাটক রচনার ক্ষেত্রে রামনারায়ণ তর্করত্নের (কুলীনকুলসর্বস্ব, ১৮৫২) সময় থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পরে এই নাটকটি রচিত হয়েছে। স্বভাবতই নাট্যকার কাহিনী, দর্শকদের আনুকূল্য, ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং স্বতোচ্ছল অভিনয়ের জন্য সংলাপের ক্ষেত্রে চলিত ভাষা — অবশ্যই মুখের ভাষাকে (কথ্য ভাষা) বিশেষভাবে ব্যবহার করেছেন। যে সময় এই নাটকটি রচিত হচ্ছে সেই সময় বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষার পত্তন হয়নি। সবে বঙ্কিমযুগের শেষ, রবীন্দ্রনাথ গল্প-উপন্যাসে সাধুভাষা

ব্যবহার করছেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকে চলিত ভাষা ব্যবহার করলেও তা তৎসম-অর্ধতৎসম, তদ্ভব শব্দবহুল। বিবেকানন্দ বললেন — বাঙালির ভাষা-বাংলা ভাষা-বাংলা সাহিত্যের ভাষা মৌখিক হতে হবে। বিশেষ করে তিনি উত্তর কোলকাতায় 'ককনি' ভাষাকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'বাঙ্গলা ভাষা' নিবন্ধে এর স্বপক্ষে তাঁর যুক্তিগুলি আমরা শুনেছি। কালীপ্রসন্নর ভাষা স্ল্যাং বা সাহিত্যের ভাষা হতে পারেনি — বিদ্বৎজনেরা এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। আর ১৯১৪তে প্রমথ চৌধুরি যে বীরবলীয় ভাষা প্রকাশ করলেন, তাতে কোথায় যেন প্রাণের অভাব। কিন্তু ১৮৯৭তে রচিত 'আলিবাবা' নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদ এমন ঝরঝরে বাংলা ভাষা ব্যবহার করেছেন যা আমরা আগে শুনতে পাইনি। তাতে তৎসম তো ছিলই না, অর্ধতৎসমও নয়। আধুনিক কথ্য, চলিত ভাষা যা কিনা বাংলা সংলাপের খাতে প্রাণের প্রবাহ বইয়ে দেয়। দেশজ শব্দের আকছার ব্যবহার অবশ্যই লক্ষণীয়। এর ফলে 'আলিবাবা' নাটকের সংলাপ তীব্র গতিসম্পন্ন হয়েছে। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে কাহিনী দ্রুতবেগে ছুটে গেছে। প্রসঙ্গত আমরা দৃষ্টান্ত দিতেই পারি; যার মধ্যে সংলাপের উপরিল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

আলিবাবা : আস্তে-আস্তে, গোল ক'র না - গোল ক'র না .....

ফতিমা : অ্যাঁ অ্যাঁ! আস্তে কইব? মোহর! সেকিগো? আমাদের মোহর কিগো? তুমি যে অবাক করলে গো! আমরা দিন আনি, দিন খাই, কোনো দিন বা পাই, না পাই, আমাদের মোহর কিগো? তুমি ডাকাতি করতে শিখেছ নাকি ? (২/৪)

'আলিবাবা' নাটকটির মধ্যে কৌতুকরস যেমন পুরোপুরি উপস্থিত, তেমনি উপস্থিত গীতিময়তা। সেই সঙ্গে গুরুত্ব পেয়েছে দার্শনিক ভাবনা। সংলাপের মধ্যে এই তিনটি বিষয় আমরা বিশেষভাবে লক্ষ করি। প্রসঙ্গত তিনটি দৃষ্টান্ত আমরা দিতেই পারি।

(ক) কাশেম : সেটা তোমার অদৃষ্টে নয় — আমার অদৃষ্টে, আমাকে সাদী করেছিলে তাই তোমার বাপের ছেলে হয়নি। নইলে আর কারো হাতে পড়লে ছেলে ছেড়ে ছেলের চোদ্দপুরুষ হয়ে যেত। আমার নসীবে ওমরাওগিরি আছে আমি মরে মরেও ওমরাও হতুম। (কৌতূকরসের প্রকাশ)

(খ) মরজি্না :

ছি ছি এত্তা জঞ্জাল

এত্তা বড় বাড়ি এস্‌মে এত্তা জঞ্জাল।

হর্‌দম্‌ লাগতা ঝাড়ু তববি অ্যায়সা হাল্‌।।

. . . . . .

ময়লা মনিম মেরা - লেংরা বেচাল।

দিল্‌ ময়লা বিবি মেরা হাজির হামেহাল।।

আবদালা : সারা ঝট্‌পট্‌ কাম করনেওয়ালা সাঁচ্চা সমজদার বহুৎ খোসমেজাজি রাজি বিবি মালিক মহলাদার।।

এইভাবে ছত্রে ছত্রে নাট্যকাহিনী এগিয়েছে কখনও সংগীতে, আবার কখনও বা কৌতুকে। (১/১)

(গ) এই নাটকের সংলাপে দার্শনিকতার প্রকাশ অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

ডাকাত সর্দার : টাকা কি আর ভোগ হবে বলে রোজগার করছি ? খোদার খাজাঞ্চি খানা। আমরা তাঁর জমিনদার। কতকাল ধরে আমাদের এই গুপ্ত ভান্ডারে ধন সঞ্চয় হচ্ছে, ... । তারপর আমাদের হাত থেকে হাত বদলে, এভার দুনিয়ার শেষপর্যন্ত চলে যাবে।'

সংলাপ সৃষ্টিতে, সংগীত সংযোজনে ক্ষিতিপ্রসাদ সার্থক তা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

৩০১.৪.১৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। সংযোজিত গান এবং সংলাপ কিভাবে নাট্যকাহিনীর সহায়ক হয়ে উঠেছে? নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

২। 'আলিবাবা' নাটকটির জনপ্রিয়তার কারণগুলি লিপিবদ্ধ করো।

৩। 'আলিবাবা' নাটকে সংযোজিত গান এবং সংলাপ কিভাবে সার্থক নাটকীয় মুহূর্ত রচনা করেছে; চরিত্রকে প্রাণ দিয়েছে। কয়েকটি উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহযোগে তা বুঝিয়ে দাও।

৪। অপেরাধর্মী নাটকরূপে 'আলিবাবা' নাটকের জনপ্রিয়তার কারণগুলি বিশ্লেষণ করো। এই নাটকটি রচনার ক্ষেত্রে ক্ষীরোদপ্রসাদ কীভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন?

৩০১.৪.১৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস — আশুতোষ ভট্টাচার্য।

২। সংলাপ ও ভিন্ন প্রসঙ্গ -- রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। রঙ্গালয়ে ইতিহাসের উপাদান - ১-৩ খন্ড — শংকরলাল ভট্টাচার্য।

৪। বাংলা নাটকের ইতিহাস - অজিতকুমার ঘোষ।

৫। রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ -- রমাপতি দত্ত (হরীন্দ্রনাথ দত্ত)।

৬। 'কথাসাহিত্য' পত্রিকা (সুমথনাথ ঘোষ এবং গজেন্দ্রকুমার মিত্র সম্পাদিত)। চৈত্র সংখ্যা, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ (ক্ষিরোদপ্রসাদ সংক্রান্ত নানা আলোচনা)।

৭। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা, আষাঢ়, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ (ক্ষিরোদপ্রসাদ সংক্রান্ত নানা আলোচনা)।

৮। 'কালিকলম' পত্রিকা, ফাল্গুন, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।

৯। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস — সুকুমার সেন, ৩য় খণ্ড।

১০। নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস — অজিতকুমার ঘোষ।

১১। রঙ্গালয়ে ত্রিশবছর — অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১২। বাংলা নাটক : ঐতিহ্য ও আধুনিকতা — তাপস বসু।

১৩। সংলাপ ও ভিন্ন প্রসঙ্গ -- রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৪। নাট্য আকাদেমী পত্রিকা — ৪

———————